Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

জয়তু নেতাজী

গণবার্তা

সূচি..... পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় ১
বিধ্বস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ১
দেশে-বিদেশে ২
অতীতের পৃষ্ঠা থেকে... ৩
গান্ধীর ভূমিকা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র ৪
মার্কিন-চীন বাণিজ্য যুদ্ধ... ৫
তেলেঙ্গানায় পিএসইউ সম্মেলন ৬
লক্ষ্যে অবিচল আপসহীন নেতৃত্ব ৭
মোদির অসাধারণত্ব
বিপজ্জনকভাবে প্রতিফলিত ৮

68th Year 42th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 15th Jan. & 22nd Jan. 2022 Joint Issue

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটি বিধ্বস্ত হচ্ছে

আগামী ২৬ জানুয়ারি বাহাত্তরতম প্রজাতন্ত্র দিবস। ধর্মনিরপেক্ষতা ন্যায়, সাম্য, স্বাধিকার এবং ভ্রাতৃত্বের শপথ নিয়ে ভারতের সংবিধান দেশবাসীর কাছে আশার বার্তা পাঠিয়েছিল। বহু ভাষা সংস্কৃতি সম্প্রদায় জাতপাত সম্পন্ন এক বিশাল উপমহাদেশের মানুষ ঔপনিবেশিক শাসনের বেড়াজাল ছিঁড়ে ফেলে নতুন ভারতে সার্বভৌম অধিকারের শক্ত জমির ওপর এবং পরবর্তীকালে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক চেতনা অভিমুখী গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলার পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছিল। অজস্র সমস্যাকীর্ণ ভারতে সেদিন সমাজতন্ত্র এবং সেকুলার শব্দগুলির ব্যবহার এবং মূল্য সম্বন্ধে বিতর্ক ও অস্পষ্টতা ছিল অনস্বীকার্য। তবুও একথা অনস্বীকার্য সংবিধানের মুখবন্ধের কথাগুলি রাজনীতিবিদ সহ জনমানসে যথেষ্টই প্রভাব বিস্তার করেছিল। একদিনে এই সব মহান লক্ষ্য কার্যকর করা যায় না, এই বাস্তববোধ সত্ত্বেও সমস্ত রাজ্যগুলির আর্থসামাজিক অধিকার এবং উন্নয়নের পরিসরে একটি প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় সমতার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়ার আভাস অন্তত ফুটে উঠেছিল।

অসম বিকাশ আর আর্থসামাজিক বিভিন্নতা ও বৈষম্যের কথা ভেবেই বিভিন্ন স্তরের সরকারগুলির ক্ষমতা ও দায়দায়িত্বের মধ্যে যাতে সুষম ভারসাম্য স্থাপিত হয় সেই অভিমুখে একটি ঘোষিত প্রচেষ্টা ছিল সংবিধানে। সপ্তম শিডিউলে ক্ষমতা ও কর্মসূচির নিরিখে কেন্দ্র রাজ্য এবং উভয়ের যৌথ সীমাক্ষেত্র সমূহ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। সম্পূর্ণ ত্রুটিবিচ্যুতিহীন ছিল সপ্তম শিডিউল, একথা কেউ বলবেন না। রাজ্যগুলির মধ্যে বৈষম্য সৃজনের কেন্দ্রীয় প্রচেষ্টা বা কেন্দ্রীয় শাসকদের কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের ইতস্তত ঘটনাও যথেষ্ট ঘটেছে। ত্রুটি বিচ্যুতি অনেকক্ষেত্রেই ছিল। পরবর্তীতে সেইসব ত্রুটি সংশোধনের প্রচেষ্টাও যে দেখা গেছে ৭৩ ও ৭৪তম সংশোধনে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের বিস্তৃতি নিম্নতম স্তরে গণতন্ত্র বিকাশের অভিমুখ সুস্পষ্ট।

পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রেখে রাজ্যসমূহের অসম বিকাশের প্রশ্নে বহুমুখী বিতর্কের অবকাশ রাখা হত। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদও রাজ্যগুলির উন্নয়নের প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিত। সেসব এখন অতীতের কথা।

মোদী জমানায় পরিকল্পনা কমিশন বাতিল করে নীতি আয়োগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্যই কেন্দ্রীয় আধিপত্য আরও বেশি করে বলবৎ করা। বিজেপি'র শাসনে জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। পঞ্চদশ ফিনান্স কমিশন কার্যত রাজ্যগুলির আর্থিক সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করেছে। মোদীর একক উদ্যোগে এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃহৎ কর্পোরেট কোম্পানির স্বার্থে যে এসব হয়েছে তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। একতরফা নোটবন্দী এবং জিএসটি তারই স্বাক্ষর।

রাজ্যের আইনসভার সম্মতি ছাড়াই ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার, ৭ম শিডিউলে যৌথ তালিকাকে নস্যাৎ করে কৃষি আইন প্রচলন, কেন্দ্রীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় স্থানীয় ভাষা প্রত্যাহার করায় তামিলনাড়ুর তিনজন ছাত্রের আত্মহত্যা, নয়া শিক্ষানীতি প্রচলন করে শিক্ষার বহুমুখী যুক্তরাষ্ট্রীয় অভিমুখ ধ্বংস, রাজ্যগুলির সম্মতির অপেক্ষা না করেই পাঞ্জাব পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যে বিএসএফের নজরদারির এলাকার ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি—সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটি ধ্বংস করছে ফ্যাসিবাদ অনুসারী হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপি।

শুধু তাই নয়, রাজ্যে রাজ্যে রাজ্যপালের সাংবিধানিক ক্ষমতা সরাসরি সংঘ পরিবারের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। সম্প্রতি প্রজাতন্ত্র দিবসে কেরালা, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলোগুলি বাতিলও কেন্দ্রের দুরভিসন্ধির নিদর্শন।

আসল কথা বহুত্ববাদী সাংবিধানিক মূল্যবোধ পদদলিত করে এককেন্দ্রিক ফ্যাসিবাদী হিন্দি-হিন্দু- হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠাই সংঘ পরিবারের একমাত্র লক্ষ্য।

অধিকাংশ জাতীয় ও রাজনৈতিক দল অল্পবিস্তর এই ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সরব হলেও যে নির্বাচনী কাঠামোটি দখল করে বিজেপি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোটি ধ্বংস করতে চায় এখনও পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা নির্বাচনী সংগ্রামে বা গণআন্দোলনে গড়ে ওঠে নি। আসন্ন কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস, আপ সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক দল সঙ্কীর্ণস্বার্থে সেই ঐক্যের প্রতিবন্ধক হয়ে বিজেপি'র প্রতি জনগণের সমর্থন নিম্নমুখী হওয়া সত্ত্বেও, কার্যত ভোটে বিজয়ীর স্তম্ভ ছোঁয়ার ক্ষেত্রে বিজেপিকেই সহায়তা করছে বলে সন্দেহ করা হয়। গভীর আশঙ্কাই ছেয়ে আছে।

বিধ্বস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

তৃণমূল ও বিজেপি'র ঘনিষ্ঠ যোগাযোগেই মানুষকে প্রতারিত করার অপচেষ্টা

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দবন্ধ। যে রাজনৈতিক দল সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে জয়ী হয় বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই দলই শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। সুষ্ঠু বা অবাধ নির্বাচনী প্রক্রিয়া বাস্তবে মান্য না হলেও রাজ্য প্রশাসন পরিচালনায় তেমন কোনও বিপত্তি হয় না। ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকেই এই ব্যতিক্রমী ঘটনাকে মেনে নিয়েছেন। অন্য কোনভাবে সুরাহার সুযোগ না থাকায় মেনে নেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকলেও সরকারি প্রকল্পগুলিকে নস্যাৎ করে, উপেক্ষা করে কিংবা অমান্য ও অস্বীকার করে দৈনন্দিন জীবনযাপন কার্যকরই শুধু নয়, অসম্ভবও বটে।

এই পরিস্থিতি যেমন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাস্তব ঠিক তেমনি, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও এই রাজ্যে যাঁরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নৈতিকতার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা ছাড়াই রাজ্যে সর্বপ্রকার নৈরাজ্যের বিস্তার ঘটিয়ে চলেছেন, তাঁদের সমালোচনা করলেও শুনতে হচ্ছে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, অতএব অন্য কেউ কোনও মন্তব্যই করতে পারেন না। অন্য কোনও ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের মনোভাব যদি শাসকদের বিশেষ বিড়ম্বনার কারণ হয় তাহলে, পুলিশ দিয়ে আমলাতন্ত্রকে যেমন তেমনভাবে কাজে লাগিয়ে এমনকি, বিচার ব্যবস্থাকেও অনৈতিকভাবে প্রভাবিত করে বিরোধীদের স্তব্ধ করার প্রক্রিয়া লাগাতার চলছেই। দলীয় গুণ্ডা বা লুম্পেনদে ব্যবহার তো আছেই। নির্বিচারে তাদের কাজে লাগিয়ে বিপক্ষকে চুপ করিয়ে দেওয়া এখন সর্বত্রই জলভাত।

রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণভাবেই নির্দিষ্ট একটি বা দুটি প্রভূতকারী শ্রেণির স্বার্থ পূরণে দায়বদ্ধ। এর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্যও বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল সক্রিয়। নিজের মতো করেই অবশ্য পুঁজিপতি শ্রেণির দল অনেক। তারা প্রায় সবাই নগ্নভাবেই পুঁজিবাদের তল্পিবাহক। পুঁজির স্বার্থরক্ষায় সদা উদগ্রীব। আবার পুঁজির স্বার্থের বিপরীতে রয়েছে আমজনতা বিশেষ করে, শ্রমকারী মানুষ। তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁদের অবদমন ছাড়া পুঁজির স্বার্থ রক্ষা করা বাস্তবে অসম্ভব। এই দুই শ্রেণির স্বার্থ পূর্ণত বিপরীত মেরুর। রাজনীতির সাধারণ ছাত্ররাও এসব জানেন। কিন্তু যা সাদা চোখে বোঝা যায় না, তাহল পুঁজিবাদের বর্তমান মহাসংকটকালে যেসব অপকৌশল করে শাসনের অধিকার বলবৎ করা হচ্ছে তার যথার্থ স্বরূপ।

নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার জ্ঞানশূন্য ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও বিশ্বপুঁজিবাদ অশেষ সংকটে দীর্ণ। মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলি নিঃশেষিত করে গায়ের জোরে মানুষকে দমিয়ে রাখা ছাড়া আর কোনও পথ নেই। আবার সেই পথে গেলে লোক সাধারণ ক্ষিপ্ত হবে, বিরোধী দলের সমর্থকে পরিণত হবে। শাসকদের পক্ষে সেটা বড়োই দুর্ভাবনার প্রসঙ্গ। সুতরাং, দেশে দেশে বিরোধী রাজনীতিকে ছলে বলে কৌশলে কব্জা করার প্রক্রিয়ায় ইদানিং বিশ্বপুঁজিবাদ বেশি বেশি ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। কিছুটা ''বিষধর সাপ হয়ে কামড় দেব, আবার বিষ ঝাড়ারও ব্যবস্থাও আমিই করবো। অন্য কারুর কোনও দরকার নেই।'' জনবিরোধী শাসকদের বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হবে অবশেষে শাসকেরই স্বার্থে।

একটু খোলসা করে বললে এই গভীর চিন্তার বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরা যাক, উত্তরপূর্ব ভারতের একটুকু রাজ্য মেঘালয়ের কথা। ওখানে জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দলের মধ্যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে দীর্ঘকাল যাবৎ। বিগত নির্বাচনে হঠাৎ করেই বিজেপি'র উত্থান। নির্বাচনী ফলাফলে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা আদৌ পায়নি। জাতীয় কংগ্রেস, এনসিপি ও নির্দল প্রার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু বিজেপি সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিপুল ক্ষমতা ও অর্থের জোরে ঘোড়া কেনাবেচার মতো এম এল এ কিনে নিয়ে বিজেপি'র সরকার গঠন করে। মুখ্যত ওই রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনে একচেটিয়া অধিকার পাওয়ার লালসায় মাফিয়াদের দল বিজেপি মেঘালয়ের সরকার গঠন করে। ওই রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিজেপি সরকারের কার্যকলাপে অতীব ক্ষুব্ধ। এবারের নির্বাচনে বিজেপি প্রকৃতই ব্যাকফুটে।

ইতোমধ্যে বিজেপি'র নতুন রাজ্য সভাপতি হয়েছেন আর্নেস্ট মউরি। দলের মধ্যে প্রচুর ক্ষোভ তাঁর বিরুদ্ধে। তিনি ইদানিং দারি করেছেন যে তাঁর বিরোধীদের মনে রাখা উচিৎ যে, তিনিই অনেক বুদ্ধি করে মেঘালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে স্থান দিয়েছেন এবং তারা মূল প্রতিপক্ষ জাতীয় কংগ্রেসকে দুর্বল করে দিয়ে বিজেপি'র জয় নিশ্চিত করবে। বিরোধী ভোটের ভাগাভাগি মানেই সরকার পক্ষের প্রভূত লাভ। যেমন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে অর্থব্যয়ে কেনা মিডিয়ার কৌশলে বিজেপি মমতা ব্যানার্জীর বিরোধী ভোট ভাগ করেছে। বিজেপি এই রাজ্যে তৃণমূলকে সহায়তা দিয়েছে। মেঘালয়ে তৃণমূল ঋণ শোধ করবে। বিজেপিকে সরকারি ক্ষমতায় রাখতে কংগ্রেসকে পর্যুদস্ত করে সুবিধা পাইয়ে দেবে বিজেপিকে।

একইভাবে গোয়ার নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি'র সুবিধা করে দেবার জন্যই ওই ক্ষুদ্র রাজ্যে কংগ্রেসকে আক্রমণ করে চলেছে। নীতিহীন নেতাদের কিনে নিচ্ছে। বিজেপি নেতা, একদা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী যথার্থই তৃণমূল কংগ্রেসকে মূল প্রতিপক্ষ বলে প্রচার শুরু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের এই চরম দুর্নীতিগ্রস্ত দলটি প্রচুর অর্থের জোগান দিয়ে বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগ করে দেবে বলেই অনেকে মনে করছেন। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক বিন্যাসে বিজেপি'র অলিখিত স্যাঙ্গাৎ হিসেবে তৃণমূল সহ আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল বিশেষভাবে অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সারদা, নারদা সহ বহু কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে যাওয়ায় তৃণমূল মোদিকে এভাবে সাহায্য করে নিজেদের বাঁচানোর অপচেষ্টায় দেশের গণতান্ত্রিক বাতাবরণকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে।

নতজানু নির্বাচন কমিশন

স্বাধীনতা অর্জনের পরেই ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে বহু রীতিনীতি, বিধিনিষেধ একদা সযত্নে নির্মিত হয়েছিল। স্বৈরাচারী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গঠনে উদ্গ্রীব বর্তমান কেন্দ্রীয় প্রশাসন সেই সব বিধিনিষেধের (Protocol) প্রতি চূড়ান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করছে, যা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে বিশেষ অনভিপ্রেত ও আতঙ্কিত হবার মত ঘটনা। বিস্ময়কর ঘটনা, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে —'অনুরোধের' নামে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার এবং তাঁর দুই সহকর্মী নির্বাচন কমিশনারকে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে হাজিরা দিয়ে কিছু বিষয়ে আলোচনা করবার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর, সচিব এমনকি প্রধানমন্ত্রীও নির্বাচন কমিশনারকে এমন অলৌকিক অনুরোধ করতে পারে না কারণ, সর্বজনবিদিত ঘটনা নির্বাচন কমিশন একটি সম্পূর্ণ স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। কেবলমাত্র সংবিধানের প্রতিই কমিশন দায়বদ্ধ। কোনও মতেই এই প্রতিষ্ঠানটি প্রধানমন্ত্রীর অধীন নয়। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সচিব প্রকারান্তরে প্রধানমন্ত্রীর এই আচরণ সাংবিধানিক শিষ্টতার সঙ্গে মানানসই নয়, গণতন্ত্রের পথে এক অতি অশুভ লক্ষণ।

বলাবাহুল্য নির্বাচন কমিশন গণতন্ত্রের প্রহরী। অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পন্ন করাই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কর্তব্য। মুখ্য নির্বচন কমিশনারের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতারা আলোচনা করতেই পারেন। মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীও নির্বাচন কমিশনারের সাথে আলোচনা চালাতে পারেন, তবে তার জন্য নির্বাচন কমিশনারকে মন্ত্রীর দফতরে তলব করা চলে না। আলোচনার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রীকেও স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনে উপস্থিত হতে হয়, উল্টোটা নয়। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্যই এমন ব্যবস্থা।

এমন আশঙ্কা অমূলক নয়, গণতন্ত্রের প্রহরী নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতার বারোটা বাজানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে তলব করা হয়েছিল। কার্যত নির্বাচন কমিশনকে এক মূক, বধির, অন্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার চক্রান্ত চলছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনার কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর দফতরে যাবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন নি। এমন অনুরোধ যে সাংবিধানিক প্রটোকলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এমন কথাও বলেন নি—অবশ্যই উদ্বেগজনক ঘটনা।

আসন্ন পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন

ওমিক্রনের ধাক্কায় বিধ্বস্ত দেশের পাঁচটি রাজ্যে ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখ থেকে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্ঘণ্ট ঘোষিত হয়েছে। প্রথামাফিক প্রচারে হরেক রকম বিধিনিষেধ পালনের নির্দেশও রাজনৈতিক দলগুলির কাছে পাঠানো হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন করার জন্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ রাজনৈতিক দলগুলিও ঐকমত্য হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতি মাথায় রেখে বৃহত্তর জনস্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলি কঠোরভাবে কোভিড বিরোধী লড়াইয়ের সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ বা প্রোটোকলগুলিকে যথাযথ মান্যতা দেওয়ার দায়বদ্ধতা পূরণ করবে এমন আশা করা গেলেও বাস্তবে তা হয়ত সম্ভব নাও হতে পারে।

যে পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন হতে চলেছে তার মধ্যে চারটিতে বিজেপি ক্ষমতাসীন। এর মধ্যে আবার উত্তর প্রদেশে ক্ষমতাসীন থাকতে পারা বিজেপি'র কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪ সালে বিজেপি ফের কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল করতে পারবে কিনা, তা উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের উপর অনেকটাই নির্ভর করবে। বিজেপি'র প্রচার ঝটিকায় হিন্দুত্ব এবং ''ডবল ইঞ্জিনে''র উন্নয়নের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী ফলাফলের উপরই নির্ভর করছে তা কতদূর ফলপ্রসূ হবে। এই রাজ্য থেকেই ৮০ জন সাংসদ লোকসভায় নির্বাচিত হয় বলেই এই রাজ্যটি আসন্ন নির্বাচনে অন্য সব রাজ্যগুলির তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বিগত বছরগুলিতে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তরপ্রদেশে রাজনৈতিক পুঁজি বাড়ানোর লক্ষ্যে অক্লান্ত প্রয়াস নির্বাচনী রাজনীতিতে এক বিশেষ ঘটনা। তদুপরি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের হিন্দুত্ববাদকে তুলে ধরার বিশেষ মডেলও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। একদিকে হিন্দুত্ববাদকে বিশেষ সুবিধা এবং অনৈতিক প্রশ্রয় দান, অপর দিকে যে কোনও প্রতিবাদ বা মতভেদকে নির্মমভাবে দমন করার যে নীতি এই রাজ্যে অনুসৃত হচ্ছে তা কতটা রাজনৈতিক ফয়দা প্রসব করবে তাও নির্ভর করছে উত্তর প্রদেশে আসন্ন নির্বাচনের ফলাফলের ওপরই।

প্রসঙ্গত ১৯৮৫-র পর থেকে উত্তরপ্রদেশে কোনও রাজনৈতিক দলই পর পর দু'বার ক্ষমতা দখল করতে পারে নি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই রাজ্যে ঘন ঘন সফর, অযোধ্যার রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন থেকে কাশী বিশ্বনাথ করিডর কমপ্লেক্সের উদ্বোধন ইত্যাদি কর্মকাকাণ্ডেই প্রতীয়মান এই রাজ্যটির নির্বাচন নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপি তথা হিন্দুত্ববাদীদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরপ্রদেশে যেমন বিজেপিকে বিরোধী দলগুলির বিশেষ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে।

পাঞ্জাবে আবার ক্ষমতাসীন কংগ্রেসেরও প্রায় একই অবস্থা। পাঞ্জাবে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসকে—বিজেপি, আম আদমি পার্টি, শিরোমনি আকালি দলের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের পক্ষে ক্ষমতা ধরে রাখাটা খুব সহজ কাজ হবে না। অবশ্য কৃষক আন্দোলন বিজেপি এবং শিরোমনি আকালি দলের জোটের মধ্যে ভাঙ্গন হলেও কংগ্রেসকেও নিজের দলের মধ্যে থেকে বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে—ফলে পাঞ্জাবের পরিস্থিতি আপাতত খুবই জটিল হয়ে উঠেছে। উত্তরখণ্ড এবং মণিপুরে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বিজেপি'র অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে, বিজেপি'র ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা অত সহজ নয়। দু'বার উত্তরখণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী পাল্টাতে হয়েছে, মণিপুরে বিজেপি'র দলের মধ্যেই রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে পরিস্থিতি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণের প্রায় বাইরেই বলা যেতে পারে।

গোয়ার পরিস্থিতি অবশ্য কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। এই রাজ্যে বরাবর দ্বিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে থাকে। এবার অবশ্য নির্বাচনী রঙ্গমঞ্চে আম আদমি পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবেশের ফলে পরিস্থিতি বেশ জটিলই বলতে হবে।

এই পাঁচ রাজ্যে বিজেপি'র বিপুল পরিমাণ রাজনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা যেমন আছে, বিরোধী দলগুলিকেও বেশ সতর্কভাবেই প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আগামী দিনে সারা ভারতের রাজনৈতিক চালচিত্রের কেমন চেহারা হবে, তার অনেকটাই নির্ভর করছে এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফলের উপর।

কাজাখাস্তানে সরকার বিরোধী জনবিক্ষোভ

গত ৬ জানুয়ারি একদা সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ অন্যতম দেশ কাজাখাস্থানের রাজধানী আলমাটিতে প্রবল জনবিক্ষোভ প্রায় বিস্ফোরণ ও বিদ্রোহের রূপ পরিগ্রহ করলো। হাজার হাজার মানুষ শহরের রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। নিরাপত্তা রক্ষীদের নির্বিচার আক্রমণের মুখে ক্ষিপ্ত মানুষদের একাংশ রাষ্ট্রপতি ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। তার পাশেই মেয়রের অফিসেও আগুন লাগানো হয়। পুলিশ বা নিরাপত্তা রক্ষীদের নির্বিচার আক্রমণে বহু সংখ্যক বিক্ষোভকারী নিহত এবং আহত হয়েছেন। পুটিনের রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ নেতা রাষ্ট্রপতি নুরসুলতান নজরবায়েভ (৮১ বছর) এবং তাঁর মনোনীত উত্তরসূরি কাসিম জোমার্ট টোকায়েভ-এর সমর্থনে দ্রুত সেনাবাহিনী প্রেরণের আশ্বাস দিয়েছে রুশ সরকার। সারা রাত্রিব্যাপী এই প্রবল বিক্ষোভে অন্ততপক্ষে ২০০০ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রয়টার্স সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে যে, কাজাখ সেনাবাহিনী বিক্ষোভকারীদের দখল করে নেওয়া দেশের মূল বিমানবন্দরটি উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে। জ্বালানি তেলের খনিগুলি নিরাপদ রয়েছে বলে জানিয়েছে ও দেশের সরকার।

প্রসঙ্গত, সোভিয়েত জমানা শেষ হবার পর থেকেই কাজাখাস্তানে নজরবায়েভ-এর একদলীয় শাসন চলছে। স্বাভাবিক ভাবেই নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের ধূমায়িত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। দেশের সরকার অবশ্য এই বিক্ষোভ বা বিদ্রোহকে অন্য দেশের ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থান বলে অভিযোগ করেছে।

পঞ্জাব সফরে বিক্ষোভের মুখে প্রধানমন্ত্রী

নতুন বছরের শুরুটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষে ভাল হয়েছে এমন বলা যাবে না। পঞ্জাব সফরকালে পথে নরেন্দ্র মোদীকে এক বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে। ফলে প্রধানমন্ত্রীকে প্রায় কুড়ি মিনিট পথেই অপেক্ষা করতে হয়। এমন অনভিপ্রেত ঘটনার তদন্ত চলাকালীন কোন ব্যাপক মন্তব্য করা কঠিন।

কিন্তু এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে যেভাবে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাবার অধিকারকেই অস্বীকার এবং নিন্দা করবার চেষ্টা চলছে তা, কোনওভাবেই সমর্থন করা যায় না। সরকারি প্রচারমাধ্যমের এমন চেষ্টা বা অপচেষ্টা রাজনৈতিক মতলববাজী ছাড়া আর কিছু নয়। যে কোনও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অধিকার প্রতিটি নাগরিকের আছে। নরেন্দ্র মোদী বা তার দল মতাদর্শগত কারণেই হয়তো এমন অধিকারকে স্বীকার নাও করতে পারেন। ক্ষমতাসীন দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ এমনকি, প্রশ্ন করাকেও বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদ্রোহের প্রমাণ হিসাবে গণ্য করাই রেওয়াজ হয়ে উঠতে চলেছে, যা গণতন্ত্রের মর্যাদা বাড়ায় না।

এমন অমর্যাদার ঘটনা বিগত কয়েক বছরে বহু ক্ষেত্রেই ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাপথে বিক্ষোভ দেখিয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করায় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন শাসক দলের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া বেশ কৌতুকজনক। যাত্রাপথে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সত্যিই কোনও গলতি ছিল কিনা তা আপাতত আদালতের বিচার্য বিষয়। কিন্তু নিরাপত্তা হানির আশঙ্কার কথা যার মুখে প্রথম উচ্চারিত হয়েছে, তিনি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। ''বাঁচিয়া ফিরিতে পারিবার জন্য'' মোদী পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। অবশ্যই ব্যঙ্গার্থে। এমন কটাক্ষ দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে তা ভাবনার বিষয়। কোনকালে ভাবাই যায় নি।

অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে গণতান্ত্রিক রীতিকে মান্যতা দেওয়ার এক বিরাট সুযোগ ছিল। নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বা নরেন্দ্র মোদীর নীতি ও আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের মুখে দাঁড়িয়ে আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারলে এক নজরকাড়া দৃষ্টান্ত দেশবাসীর কাছে রাখতে পারতেন নরেন্দ্র মোদী। নিছক রাজনৈতিক কৌশল হিসাবেই একজন Statesman বা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগটি মোদীজী হেলায় হারালেন। অবশ্য এমন উদারমানসিকতা হাল আমলের কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে প্রত্যাশিত নয়। নরেন্দ্র মোদীর কাছেও নয়।

নওদার আমতলায় পি এস ইউ'র উদ্যোগে রক্তদান শিবির

করোনা ভাইরাসের তৃতীয় ওয়েভের প্রভাব আসার পর গোটা রাজ্যের সাথে সাথে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। এই অবস্থায় 'মানুষ মানুষের জন্য' এই কথাকে পাথেয় করে পি এস ইউ নওদা লোকাল কমিটির উদ্যোগে ছাত্র আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা তথা নওদার প্রাক্তন বিধায়ক সর্বজন শ্রদ্ধেয় কমরেড জয়ন্ত বিশ্বাসের চতুর্থ প্রয়াণ দিবসে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় আমতলাতে। প্রথমে প্রয়াত নেতার মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এদিনের রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন পিএসইউ এর রাজ্য সম্পাদক কম. নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কম. হাবিবুর রহমান সোহেল ও আর এস পি'র মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক কম. বিশ্বনাথ ব্যানার্জী। আর এস পি জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কম. অমলাংশু বিশ্বাস, আর এস পি নওদা লোকাল কমিটির সম্পাদক কম. আতাউর রহমান। পি এস ইউ-এর নওদা লোকাল কমিটির সম্পাদক কম. রুবেল সেখ জানিয়েছেন এদিনের শিবিরে ৮৪ জন রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরকে ঘিরে আমতলা বাজার পি এস ইউ-এর পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। এবং এলাকার মানুষের উৎসাহজনক উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রয়াত নেতা কমরেড জয়ন্ত বিশ্বাসের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এদিন উপস্থিত হয়েছিলেন।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে : দি কল, মে ; ১৯৭২

‘বাংলাদেশ’-এর উদ্ভব ও দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষমতাবিন্যাসের রূপান্তর

ত্রিদিব চৌধুরী

মার্কসবাদে প্রত্যয়ী বিপ্লবী এবং প্রগতিশীল বামপন্থী মহল সাধারণভাবেই দেশের শ্রমিক আন্দোলন, বিশেষ করে বিপ্লবী সমাজবাদী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষমতাবিন্যাসের এবং রূপান্তরের বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং ভোটের ফলাফলে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের প্রভাবে বর্তমান রাজনীতি ও শ্রেণি অবস্থানগত বিশ্লেষণে আমাদের বামপন্থীদের পক্ষ থেকে বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা যথেষ্ট। যে কোন মূল্যে এই নেতিবাচক সম্ভাবনা থেকে মুক্ত থাকতেই হবে।

আমরা যেন কখনই ভুলে না যাই যে, ভারত সহ যে কোন দেশেই অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক পরিসরে সেই দেশের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক তথা রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট দেশটি কোন বিন্যাসের অন্তর্ভুক্ত সেই বিষয়গুলির উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং শ্রেণি সম্পর্কের উপর আবার নির্ভরশীল সেই দেশের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্বীকৃতি ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু বর্তমান যুগে পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক শক্তিবিন্যাসের প্রভাব থেকে কোন বিশেষ সময় ও ঘটনার প্রেক্ষিতে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ বা মুক্ত থাকতে পারে না।

ছোট এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর বৃহৎশক্তির চাপিয়ে দেওয়া বাধ্যবাধকতা

অধিকাংশ সদ্যস্বাধীন প্রাক্তন উপনিবেশগুলি যারা, তথাকথিত সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে পেরেছে, তারাই সর্বাপেক্ষা বেশি মাত্রায় এই বাধ্যবাধকতার শিকার। এই ধরনের অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তির দিক থেকে খুবই দুর্বল। যতটুকু স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা তারা অর্জন করেছে আপেক্ষিক বিচারে তা এখনও সামান্য। আন্তর্জাতিক, এমনকি বিভিন্ন ভৌগোলিক আঞ্চলিক পরিসরে তাদের স্বাধীনভাবে নীতি নির্ধারণের ক্ষমতাও অত্যন্ত সীমিত। তাদের অনেকেই বৃহৎ ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলির আধিপত্য মেনে নেওয়ায় মহাজন-খাতকদের মত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শুধুমাত্র তাদের সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয় কখন মহাশক্তিধর দেশগুলি স্বার্থের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে একে অপরের সাথে কূটনৈতিক-রাজনৈতিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে। সেই সময় দু’পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব সুযোগসুবিধা আদায় করার জন্য সচেষ্ট হয় ছোট ও দুর্বল দেশগুলি। ঠাণ্ডাযুদ্ধের কালে নেহরুর যুগে এদেশের বুর্জোয়ারা সেই তথাকথিত প্রখ্যাত জোট-নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে বিবদমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইংলন্ড প্রভৃতি পশ্চিমী দেশ বনাম সোভিয়েত ইউনিয়ন-চিন ইত্যাদি তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সংঘাতের সুযোগের সদ্ব্যবহার করত।

স্বাভাবিকভাবেই এই সব দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি ও তাদের আন্তঃসম্পর্ক সমূহ এতদঞ্চলের ভৌগোলিক পরিসরে ক্ষমতাশীল শক্তিকে অক্ষ করে আবর্তিত হয়। এই ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ততকাল ব্যাপী চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের নিজস্ব সংঘাতগুলি স্থিতাবস্থা ভেঙে গিয়ে নতুন ধরনের রাজনৈতিক অথবা শ্রেণিশক্তির উত্থান ঘটে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন ধরনের ক্ষমতার সন্ধান পায়।

মার্কিন-চিন সখ্য : ভূ-রাজনীতিতে শক্তিবিন্যাসের পরিবর্তন

বর্তমান দশকে আন্তর্জাতিক পরিসরে শক্তি ও ক্ষমতার বিন্যাসে কতগুলি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম, সোভিয়েত-চিন সংঘাত। দ্বিতীয়, গত ডিসেম্বরে ভারত-পাক যুদ্ধের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিভাজন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব।

চিন-সোভিয়েতের সংঘাতের ফলস্বরূপ মার্কিন-চিন সখ্যের ঘটনা দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়েছে। গণপ্রজাতান্ত্রিক চিন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তযুদ্ধে সম্পর্কের তিক্ততা অনেকটা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চিনের রাজনৈতিক নিরাপত্তা তথা রণনীতিগত স্বার্থের কারণেই চিনকে আমেরিকামুখী করে তুলেছে। সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের নিরিখে দেখলে ক্যাম্প-ডেভিডের ব্যর্থতা এবং ক্রুশ্চভের আমলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির ক্রম অবক্ষয় ক্রমশ দুটি দেশের মধ্যে আর্থরাজনৈতিক কূটনৈতিক সংঘাত ঘনিয়ে নিয়ে এসেছে। ভূ-রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটালেও তখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষ যুদ্ধের আবহ ঘনিয়ে আসে নি। মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ভারত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর, বা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া—সমস্ত এলাকাতেই রণনীতিগত দিক থেকে এই দুটি সুপারপাওয়ারের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ওদিকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে ক্রমাগত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থরাজনৈতিক পরিসরের দূরত্ব বৃদ্ধির ফলে মার্কিন-চিন সখ্যের বিষয়টি দুটি দেশের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এছাড়া এশিয়া, আফ্রিকা সহ লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণ আন্দোলন এবং আমেরিকার আর্থ রাজনৈতিক সংকট আমেরিকাকে অনেকটাই বাধ্য করেছে তাদের চিরশত্রু চিনের সঙ্গে মৈত্রীর পথ খুঁজে নিতে।

আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী শিবির এবং সমাজবাদী শিবির উভয় ক্ষেত্রেই ভাঙনের পরিণতি

মার্কিন-চিন সম্পর্কের বর্তমান সখ্য রচিত হয়েছে, এই ভৌগোলিক রাজনীতির আবহে বিভিন্ন ধরনের শক্তিসমাবেশ ও জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার নেতৃত্বে উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহের সঙ্গে সোভিয়েত-চিন সহ পূর্ব ইউরোপের দ্বিমেরুকরণের ইতিহাস আমরা অতীতে ফেলে এসেছি। ষাটের দশকের পুঁজিবাদ বনাম সমাজবাদের আদর্শগত কারণে দ্বিমেরু ক্ষমতার বিন্যাস বর্তমানে অন্য ধরনের বিন্যাস দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। পুঁজিবাদী দেশ হোক, আর তথাকথিত একদা সমাজবাদী শিবিরভুক্ত দেশই হোক, প্রত্যেকেই আজ আদর্শগত ছুঁতমার্গকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই আমরা ভূ-রাজনীতি ও অর্থনীতির পরিসরে আর মাত্র দুটি শিবির নয়, পাঁচটি শিবিরের অবস্থান লক্ষ করছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপিয়ান কমন মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ, চিন এবং জাপান। ভবিষ্যতে এই সব সুপার পাওয়ারের আন্তঃসম্পর্কই পৃথিবীর রাজনৈতিক অভিমুখ নির্মাণ করবে।

দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবর্তিত ক্ষমতার বিন্যাসের নিরিখে বলা যায়, মূলত মার্কিন-চিন সম্পর্কের মুখোমুখি ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীই পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই ধরনের বিভাজন এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভবের অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ। ১৯৪৭ সাল থেকেই অখণ্ড ভারতবর্ষের পার্টিশনের পর থেকেই কাশ্মীর ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে ভারত বনাম পাকিস্তানের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক বর্তমান, কখনও কখনও তা সীমান্তযুদ্ধেও পর্যবসিত হয়েছে। ১৯৫৯ সালে ইন্দো-চিন সীমান্তে চলমান সংঘাতের ঘটনাগুলি শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ সালে চিন-ভারত সীমান্তযুদ্ধে পরিণতি লাভ করে। ভারতের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণেই পাকিস্তান আর চিন কিছুটা কাছাকাছি আসতে শুরু করে। অন্যদিকে সোভিয়েত ও আমেরিকা উভয়েই ক্ষমতার প্রভাব বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার গতি ক্রমশ বাড়াতে থাকায় চিন এবং আমেরিকার মধ্যে রাজনৈতিক তথা কূটনৈতিক বোঝাপড়া এক ধরনের সখ্যে পরিণত হয়।

ওয়াশিংটন-পিন্ডি-পিকিং অক্ষ বনাম মস্কো-নিউ দিল্লি-ঢাকা অক্ষ

ওয়াশিংটন-পিন্ডি-পিকিং অক্ষের সূত্রপাত হয় যখন, মাও-জে-দঙের সুপারিশে চৌ এন লাই-এর আমন্ত্রণে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের পরামর্শদাতা হেনরি কিসিঙ্গার গোপনে চিনে গিয়ে পৌঁছোন। এই ঘটনা সারা দুনিয়াকেই চমকে দিয়েছিল। অন্যদিকে চোদ্দদিনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয় এবং সার্বভৌম স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাও সোভিয়েত-ভারত মৈত্রীর সাক্ষর রেখে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এক ধরনের রাজনৈতিক আধিপত্যের আবহ রচনা করতে সমর্থ হয়েছে। কার্যতই এই ধরনের ঘটনাক্রম ওয়াশিংটন-পিকিং-পিন্ডি অক্ষের শক্তি হ্রাস করেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তথা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এখন সোভিয়েত সুপার পাওয়ারেরই আধিপত্য।

সবার উপরে এখন দক্ষিণ ভিয়েতনামের পুতুল তথা পরগাছা সরকার যদি দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তিবাহিনীর সামরিক প্রতিরোধে সোভিয়েতের সামরিক সহায়তায় পর্যুদস্ত হয়, তবে অবিলম্বে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার আধিপত্যজনিত প্রভাব ভীষণ হ্রাস পাবে।

পাকিস্তানের প্রভাব ক্ষীণ করে এতদঞ্চলে ভারতের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি

অবশ্যই বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে বলা যায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসে পাকিস্তানের এই পরাজয়, একটি বৃহত্তর ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভবে ভারতের অনন্য ভূমিকা, এতদঞ্চলে ভারতের আধিপত্য বৃদ্ধি করেছে। এটা অবশ্য সত্য যে, পাকিস্তান এখনই রাজনৈতিক ক্ষমতার মঞ্চ থেকে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যায় নি। চিন এবং আমেরিকার সঙ্গে সখ্যের সূত্রে তার হৃত প্রভাব মেরামতের জন্য সচেষ্ট হবে। পাশাপাশি নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যও প্রয়াসী হবে। কারণ গত বছরের মতো জাতীয় নিরাপত্তার জন্য আর অতটা পরিমাণ মার্কিন-চিন সহায়তার উপর নির্ভরতা যে পাকিস্তানকে আরও দুর্বল করে ফেলবে সেই বিষয়টি পাকিস্তানের কাছে স্পষ্ট। চিন এবং আমেরিকাও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন রণকৌশল গ্রহণ করবে, কারণ তারা স্বীকার করে যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের উদ্ভব একটি অবশ্যগ্রাহ্য বাস্তবতা। একে অস্বীকার করার কোন উপায় আর নেই।

আমেরিকা ও চিন নবোদ্ভূত পরিস্থিতি মানিয়ে চলার লক্ষ্যে উদগ্রীব

বাংলাদেশের গণঅভ্যুত্থানের মুখোমুখি বৈরীভাব প্রদর্শন করলেও বাংলাদেশের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রশ্নে নিক্সন সরকার ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে নতুন রাষ্ট্রের সদ্য ঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও গৃহযুদ্ধে জনসাধারণের দুর্দশার সদ্ব্যবহার করে মানবিক মুখ দেখিয়ে আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়েছে। চিন এখনও কূটনৈতিক স্বীকৃতির প্রশ্নে নীরব। কার্যত তার মিত্র আমেরিকার মতই বাস্তবতাটাকে স্বীকার করে মার্কিন-চিনের ক্লায়েন্ট রাষ্ট্র পাকিস্তানের সামরিক ক্ষমতার অবক্ষয় এবং পূর্ব পশ্চিম দুটি সীমান্তে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবার ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের বিষয়ে নতুন রণকৌশল গ্রহণের কথা ভাবছে। সর্বোপরি ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রীর অন্তর্নিহিত শক্তিটাকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছে না।

পরিবর্তিত পরিস্থিতি আমাদের দেশের রাজনীতিকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নতুন ধরনের ক্ষমতার অক্ষ এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতীয় উপমহাদেশে মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের অবশ্যই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে রণকৌশলের অভিমুখ নির্ধারণ করতে হবে। প্রথম, নতুন পরিস্থিতিতে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় রণনীতি ও কূটনৈতিক লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন অপেক্ষাকৃত যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে।

দ্বিতীয়, ১৯৬২ সালে চিন-ভারত যুদ্ধে চিনের কাছে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করার যন্ত্রণার উপযুক্ত জবাব ভারত দিতে পেরেছে ১৯৭১ সালের ভারত-পাক যুদ্ধে। ফলে ভারতের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার হয়েছে এবং অতীতের রাজনৈতিক তথা সামরিক পশ্চাদপসরণ জনিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে এতদঞ্চলের প্রতিবেশী দেশগুলির উপর প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর ৬ পাতায়

ইতিহাসে গান্ধীর ভূমিকা প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসু

|||| পার্থসারথি দাশগুপ্ত ||||

সূত্র : The Role of Mahatma Gandhi in Indian History

সুভাষচন্দ্র বসু এবং গান্ধীজীর সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সাংগঠনিক অবস্থান বিষয়ে হরিপুরা ও ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বনাম গান্ধীজীর সংঘাতটি আজও বহুল আলোচিত বিষয়। সেই সংঘাতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত ও ১৯৩৮-৪০-৪১ সাল পর্যন্ত দেশের গণ আন্দোলনে তার প্রভাব আজও ঐতিহাসিক মহলে বিতর্কের ঝড় তোলে।

গান্ধীজী সম্বন্ধে সম্ভবত ১৯৩৩-৩৪ সালে সুভাষচন্দ্র ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছিলেন, তখনও পর্যন্ত দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্যন্ত সেই আলোচনা পরিপূর্ণরূপে বিশ্লেষিত হওয়ার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্রের আলোচনা আজও কয়েকটি দৃষ্টিকোণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও সমৃদ্ধ।

উল্লিখিত প্রবন্ধের সূত্রপাতেই সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন ''ইতিহাসে কোনো ব্যক্তির ভূমিকা অংশত তাঁর শারীরিক ও মানসিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। বাকীটা সময়ের চাহিদা এবং পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল যা দেশের জনসাধারণের কাছে সহজেই বার্তা পাঠায়। অন্য কোনো দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করলে সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে প্রমাণিত হতেন। ধরা যাক্, রাশিয়া, জার্মানী বা ইতালিতে জন্মালে তিনি কি কিছু করতে পারতেন? তাঁর অহিংসার আদর্শ তাঁকে ক্রুশের কাছে অথবা মানসিক হাসপাতালের দিকে পরিচালিত করত। ভারতে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর সহজ সরল জীবনচর্যা, ছাগলের দুধ পান, প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে নীরবতা পালন, তাঁর নিরামিষ খাদ্যতালিকা, চেয়ারে না বসে মেঝেতে অবস্থান করা, সামান্য বস্ত্রখণ্ডে শরীর আবৃত করা, সব কিছু মিলে তিনি দেশবাসীর চেতনায় ভারতের প্রাচীন ঋষিদের ভাবমূর্তিতে প্রতিফলিত হয়েছিলেন। এর ফলেই তিনি সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। যেখানেই তিনি যেতেন, দেশের আপামর দরিদ্র মানুষ তাঁকে ভারতের মাটিতে আবির্ভূত মহাপুরুষ বলে গ্রহণ করতেন—হাড়ে মাংসে ভাবনায় তাঁকে ভারতীয় ঋষি বলেই আরাধ্য করে নিতেন। মহাত্মা যখন কথা বলতেন কখনোই হার্বার্ট স্পেন্সার বা এডমান্ড বার্ক, এমনকি আমাদের দেশের স্যার সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর ভাষায় কথা বলতেন না, ভগবৎগীতা এবং রামায়ণের ভাষ্যে কথা বলতেন।

সাধারণ মানুষের কাছে প্রাসঙ্গিক স্বশাসন বা যুক্তরাষ্ট্র, ইত্যাদি ভাষা ব্যবহারই করতেন না। রামরাজ্যের কথা বলে জনসাধারণকে সহজতর ভাষায় বোঝাতেন।''

স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন দশক পরে প্রখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ত্রিদিব চৌধুরীর গান্ধীজী সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের প্রবন্ধটির সঙ্গে একই শিরোনামে গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাটিতে কার্যত সুভাষচন্দ্রের ব্যাখ্যারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ত্রিদিব চৌধুরী লিখেছেন, ''বলাবাহুল্য, শুধুমাত্র গান্ধীজীর বিপুল আন্তর্জাতিক অন্তর্দৃষ্টি, সার্থক গণ-নেতৃত্ব এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে সে রকম মনে করা বাস্তবসম্মত হবে না। গান্ধী নেতৃত্বের এই সব বিশিষ্টগুণের বা তাঁর প্রতি বিন্দুমাত্র অমর্যাদা বা অসম্মান না দেখিয়েও নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে, ইতিহাসের বিশেষ মুহূর্তে ব্যক্তি নেতৃত্বের ভূমিকা যত বিরাট বা গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, সে ভূমিকা পরিবেশ নিরপেক্ষ হয় না, সম্পূর্ণভাবেই পরিবেশ নির্ভর হয়। 'The hour makes the man.''

সুভাষচন্দ্র গান্ধী চরিত্রের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণে সময় ও পরিবেশ সাপেক্ষে যথার্থই বলেছেন, ''১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কালে দেশের জনগণ যখন সশস্ত্র লড়াই-এর পথ খুঁজেছে, তখন কি গান্ধী সেই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতেন? মহাত্মার উত্থানের কারণ একদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিকতা এবং অপরদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা। কারণ গত শতাব্দীর আশির দশক থেকে তর্কবিতর্কে দক্ষতা ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরোধিতাই ছিল মুখ্য। সেই পরিবেশে গান্ধীজী এত বিখ্যাত হতে পারতেনই না। বর্তমান শতাব্দীতে মানুষ ঐ ধরনের সাংবিধানিক তর্কবিতর্কে আস্থা হারিয়েছেন। নতুন নতুন পথ সন্ধান করে স্বদেশী আন্দোলন (দেশীয় শিল্প ইত্যাদির বিকাশ), পাশাপাশি সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামও জন্ম নিয়েছে, ছড়িয়ে পড়েছে। যত দিন গেছে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন জমি খুঁজে পেয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আন্তর্জাতিক সংকটের সুযোগে সারা ভারত ব্যাপী সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা হয়। সেই সশস্ত্র গণ বিপ্লবের ব্যর্থতা এবং ১৯১৯ সালে ঔপনিবেশিক শাসকদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি ও ক্ষমতা নিয়ে নৃশংস অত্যাচারের পথ বেছে নেওয়ায় দেশবাসী অনুভব করলেন শারীরিক শক্তি বা ক্ষমতা দিয়ে সেই আসুরিক শক্তিকে পরাজিত করা যাবে না।

১৯২০ সালের ভারত এক যুগ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সাংবিধানিক পথ রুদ্ধ, সেই মুহূর্তে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ চরম পাগলামি। কিন্তু এভাবে নীরবে এই সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে চিরকাল সহ্য করা যায় না। অন্য কোন নতুন পথ, নতুন কোন নেতার আবির্ভাবের পরিবেশের মধ্যে ইতিহাসের কুশীলব মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব। এতদিন পর্যন্ত তিনি বহুদিন ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এই মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবার অপেক্ষায়। তিনি নিজেকে জানতেন, জানতেন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সেই পর্বে দেশবাসী কি চায়। সংগ্রামী নেতার মুকুট তাঁরই মাথায় পরিয়ে দিল দেশের আপামর জনসাধারণ।''

পরবর্তীকালে রাজনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকদের একাংশ গান্ধী-সুভাষ সম্পর্কে শুধু নয়, সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, তাঁর অত্যধিক ভাবপ্রবণতা, দুঃসাহসী রোমান্টিক চারিত্র বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি মুক্তি সংগ্রামে রণনীতি গ্রহণে আন্তর্জাতিক স্তরে দুটি বিপরীত মতাদর্শ অনুসারী শিবিরের মধ্যে একটি বিশেষ শিবির পছন্দ না করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বহুমুখী বিশ্লেষণ করেছেন। ফলস্বরূপ এক ব্যাপক বিভ্রান্তির কুয়াশা নির্মিত হয়েছে তাঁকে নিয়ে। বিভিন্ন বিবদমান রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী এসব সত্ত্বেও তাঁর ভাবমূর্তিকে সঙ্কীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করেছে, আজও করছে।

সুভাষচন্দ্র মার্কসবাদে প্রত্যয়ী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। তবুও গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ব্যাখ্যার পরিসরে অবশ্যই মার্কসবাদী তাত্ত্বিক প্লেখানভের role of individual in history তে যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা, তাঁরই যেন অনুসারী সুভাষচন্দ্র। পরবর্তীতে সুভাষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুধু নয়, তাঁর ভাবনাচিন্তারও অনেক সময়েই যেন মার্কসের 'প্রিফেস' এবং 'ফায়ারবাখে'র সমালোচনায় সূত্রগুলির ব্যাখ্যার স্মৃতি উদ্দীপিত করে। মার্কস-এঙ্গেলস বহুবার বলেছেন, কোনো পরিবেশের রূপান্তর ঘটানোর পথ অন্বেষণ করতে গেলে, মনে রাখতে হবে মানুষ মূল নিয়ামক শক্তি হলেও আমাদের ভালো লাগা বা মন্দ লাগার উপর নির্ভর না করেই পরিবেশ অবিরত বদলে চলেছে। পরিবেশকে বদলে দিতে চাইলে তার নিজস্ব বিবর্তন রূপান্তরের গতি ও ধরন ভালো করে অনুধাবন করা ছাড়া বিকল্প নেই। কোন পরিবর্তন অপরিহার্য তার সঙ্গে সামাজিক মানুষের সচেতন কর্মজীবনকে মিলিয়েই বিপ্লবী ক্রিয়ার পথ নির্ধারিত হয়। সুভাষচন্দ্রের রচনায় গান্ধীর ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে উত্থানের কারণ সম্বন্ধে মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ত্রিদিব চৌধুরীর ব্যাখ্যাও একসূত্রে গ্রথিত, ''মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম দেশের লোকের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করল না। ...সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদের বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণি স্টীমরোলার চালিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করে নি। রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেশের মানুষকে অধৈর্য করে তুলেছে। বনেদী নেতাদের আবেদন নিবেদন ব্যর্থ। দেশবাসী এমন কিছু করতে চাইছে যাতে সাম্রাজ্যবাদী শাসক পর্যুদস্ত হয়, তাকে উৎখাত করা যায়, উচ্ছেদ করা যায়। মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণমানসের চাহিদা বুঝে দেশের অভিজাত উচ্চমধ্যবিত্ত বুর্জোয়া 'এলিট' সম্প্রদায়ের ভেতর সীমাবদ্ধ রাজনীতির মোড় ফিরিয়ে, তাকে জনসাধারণের ভেতর মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত চাষী মজুর এবং সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর প্রতিষ্ঠা করা।'' আমদের মনে রাখতে হবে আমাদের মত অনুন্নত কৃষি প্রধান দেশে নবোত্থিত পুঁজিবাদী শক্তির বিকাশের নিয়ন্ত্রিত এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিসরে অবরুদ্ধ শক্তির পাশাপাশি শ্রমজীবী শ্রেণি, নিপীড়িত কৃষিজীবী সহ সমগ্র দেশবাসীর কাছে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম মূলত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন উৎখাতের সংগ্রাম। শ্রেণি চরিত্রের নিরিখে তা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। লেনিন two tactics গ্রন্থে এবং পরবর্তীকালে লেনিনের জীবিতকালেই ঔপনিবেশিক নীতি প্রসঙ্গ কমিনটার্নে এই সংগ্রামের সীমাবদ্ধতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছিল। বহু শ্রেণি সমন্বিত এই বিপ্লব শ্রমজীবী শ্রেণির নেতৃত্বে কৃষিজীবী জনতা সহ সমগ্র দেশবাসীর সচেতন অংশগ্রহণে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের পথ মসৃণ করে। নতুবা বুর্জোয়া শ্রেণির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুভাষচন্দ্র গান্ধীর রাজনৈতিক উত্থানের এক দশকের মধ্যেই দেখা দিল জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে একদিকে গান্ধীর সর্বব্যাপী প্রভাব, অন্যদিকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথে শ্রেণি সমন্বয়ের দুর্বলতা। সুভাষচন্দ্র লিখছেন, ''একথা অনস্বীকার্য তাঁর নীতি ছিল সমন্বয়ধর্মী। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান, উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণ, পুঁজিপতির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণি, জমিদার-জোতদারের সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়। তাঁর এই ধরনের মানবিকতাবাদ শত্রু শিবিরেও শ্রদ্ধা জাগায়।

কিন্তু তিনি ব্যর্থ। কারণ তাঁর অনুগামীর সংখ্যা সীমাহীন। কিন্তু তাঁর আদর্শ অনুসরণকারীদের চরিত্র অন্যরকম। তিনি ব্যর্থ, কারণ নিজের দেশের মানুষকে বুঝতে পারলেও শত্রুপক্ষের শক্তি এবং চরিত্র অনুধাবন করতে পারেন নি। তিনি ব্যর্থ, কারণ তিনি আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবহার করতে অপারগ। তিনি বিভিন্ন বিরোধী শক্তি ও শ্রেণির যে সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করেছেন তা শেষ পর্যন্ত তাঁর শক্তির উৎস না হয়ে, ভিতর থেকে রাজনৈতিক যুদ্ধে তাঁর শক্তির অবক্ষয় ঘটিয়েছে। আমার প্রত্যয়, ভারতের ভবিষ্যত পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করছে মৌলিক পরিবর্তনের আদর্শঋদ্ধ অসংখ্য বিপ্লবী কর্মীদের উপর, যাঁরা সীমাহীন ত্যাগ ও যন্ত্রণাকে আন্তরসম্পদ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে দেশবাসীকে সংগঠিত করবেন।''

গান্ধীজীর ডাকে এদেশে চম্পারণ সংগ্রাম থেকে শুরু করে রাওলাট আইন বিরোধী সংগ্রাম এবং সর্বোপরি বয়কট আন্দোলনে সর্বব্যাপী সাড়া মিলেছিল। কিন্তু সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বে তাঁর অবসর নেওয়া, উপাসনা ও সেবা কর্মে আত্মনিবেদন করার বিষয়ে সেই সময়েই সুভাষচন্দ্র গান্ধী নেতৃত্বের দুর্বলতা সম্বন্ধে দেশবাসী ও বিপ্লবী কর্মীদের সচেতন করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি উল্লিখিত প্রবন্ধে লিখছেন, ''আমরা সক্রিয় রাজনীতি থেকে ইতিপূর্বেও তাঁকে অবসর নিতে দেখেছি ১৯২৪-২৮ সালে। তিনি চিরকালের জন্য অবসর গ্রহণ করবেন কিনা নির্ভর করবে ব্রিটিশ সরকার কি করে তার উপর। যদি তিনি সত্য সত্যই দেশবাসীকে কিছু দিতে পারেন, তবেই তাঁর স্থান ভারতবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হবে। তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সার্থক হলেই তাঁর উপর জনগণের বিশ্বাস পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে।''

সুভাষচন্দ্র যে সময়ে এই প্রবন্ধ লিখছেন, সেই সময়ের পূর্ববর্তী এক দশকের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ১৯২৮-২৯ সালের মন্দার কবলে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশসমূহে অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়ে দেয়, সমস্ত ধরনের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়। উত্তাল ভারতবর্ষের মানুষের গণ আন্দোলনের চাপে ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণস্বরাজের দাবি ঘোষণা করে। এদিকে নেতৃত্বের তোয়াক্কা না করে ১৯৩০-এ গাড়োয়াল সেনারা মুসলমান বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালনা করতে অস্বীকার করে। ওদিকে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, গান্ধীকে বন্দী করার প্রতিবাদে শোলাপুর থেকে শ্রমিক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। গান্ধীর ডাকে আইন অমান্য আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ১৯৩১ সালে গান্ধী আরউইন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। সেই বছরেই ভগৎ সিং ও তাঁর সহযোদ্ধাদের ফাঁসি হয়। কংগ্রেসের বামপন্থী অংশ প্রথম গোলটেবিল চুক্তি মেনে নেয় নি। এসব সত্ত্বেও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী অংশগ্রহণ করেন এবং একতরফা ভাবে সীমিত অর্থে স্বায়ত্তশাসন অনুমোদিত হয়। গোলটেবিল বৈঠক দুটির ব্যর্থতা, গারোয়ালি সৈন্যদের উপর শাস্তি প্রত্যাহার না করা, সশস্ত্র বিপ্লবীদের ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদের মুক্তি প্রভৃতি কিছুই না হওয়ায় বামপন্থীদের চাপে আবার গান্ধীজী অহিংস লবণ সত্যাগ্রহের ডাক দেন। আবার ১৯৩২ সালে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই আন্দোলন প্রত্যাখ্যাত হয়।

সেদিনের সেই বাস্তব পরিস্থিতির জমিতে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র প্রশ্ন উত্থাপন করেন (এই সব প্রশ্নই পরবর্তীতে সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক ভূমিকার শর্ত নির্মাণ করে) ''যেভাবে ব্রিটিশ শাসকরা অনমনীয় মনোভাব দেখাচ্ছে তাঁর মুখোমুখি কি গান্ধী নেতৃত্ব প্রতিরোধের সংগ্রাম সংগঠিত করতে পারবেন? সেটা নির্ভর করে কতটা র‍্যাডিকাল নীতি ও কর্মসূচি তিনি গ্রহণ করতে পারেন। দেশের সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে আদৌ আরো রাডিক্যাল পথগ্রহণ করতে কি তিনি পারবেন? তখনই মাত্র বর্তমান আন্দোলনের নায়ক ভবিষ্যতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অবিস্মরণীয় নায়ক রূপে ইতিহাসে জায়গা করে নেবেন।'' গান্ধীর ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ সম্পর্কিত প্রবন্ধের উপসংহারে সুভাষচন্দ্র আবার সেই প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন, ''একটা সময় যে বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর সমন্বয় তাঁর আন্দোলনের সাফল্য এনে দিয়েছিল, ভবিষ্যতে সেই রণকৌশলই সম্ভাব্য ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

যদি দেশের বিভিন্ন যূথধান গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে আন্দোলন চালিয়ে যায়, তবে সমাজের অভ্যন্তরস্থ সংগ্রামগুলিকে দমিয়ে রেখে গান্ধীর নেতৃত্বের চিরস্থায়ী হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তা বাস্তবে কখনই সম্ভব নয়। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও শ্রেণি যারা ধনী ও প্রচুর সম্পত্তির মালিক, সমাজে তারা বিত্তহীনদের বিদ্রোহের ভয়ে ক্রমশ শঙ্কিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দিকে ঝুঁকবে।....মহাত্মা দেশের স্বার্থে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণ থেকে মুক্তি তাঁর নেতৃত্বে আসবে না।''

মার্কিন চীন বাণিজ্যযুদ্ধ কি প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হতে চলেছে?

তুষার চক্রবর্তী

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাস্ত করে নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন ঠিক তখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা প্রধান জন রাটক্লিফ ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত একটি দীর্ঘ নিবন্ধে চীনকে ''দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ওপর সবচাইতে বড় হুমকি'' বলে দাবি করেন। অভিযোগটি ব্যাখ্যা করা কঠিন। কেননা চীন নিজের দেশে যাই করুক, সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় হামলা করে, দেশ দখল করে, কোনো দেশের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে এমন প্রমাণ বর্তমানেও নেই, ইতিহাসেও নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো যে কোনো ছুতোনাতায় অন্য গণতান্ত্রিক দেশে স্বৈরাচারী সরকার কায়েম করার হিম্মত চীন কস্মিনকালেও দেখিয়েছে বলে কারো জানা নেই। তাহলে, এই গুরুতর অভিযোগ কেন?

রাটক্লিফের নিবন্ধটি পাঠ করলে দেখা যাবে যে সেখানে প্রধান অভিযোগ এটাই যে চীন মার্কিন প্রযুক্তি চুরি করে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে, যার ফলে, বিশ্ববাজারে আমেরিকার কোম্পানিগুলি ক্রমশ পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে। এই অভিযোগটাই যে আমেরিকার আসল অভিযোগ সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাতে কিছু সারবত্তা নেই এমনটা বলা যাবে না। কোন পুঁজিবাদী কোম্পানি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় এই ধরনের ঘটনাও নতুন কিছু নয়। মোদ্দা কথাটা হলো, নিজের অর্থনীতির পতনের কারণেই বিশ্বের প্রতিটি মঞ্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী চীনকে কোণঠাসা করতে উঠেপড়ে লেগেছে।

মাও সে তুং-এর নয়া গণতন্ত্র যদিও কৃষক শ্রমিক ধনিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সহযোগিতার ভিত্তিতে জনগণের গণতন্ত্র হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত, কিন্তু নিজের দেশে গণতন্ত্র বা স্বাধীন জনমতের কোনো স্থান চীনে বস্তুত নেই। তেমনি এটাও সত্যি যে চীন নিজেকে বিশ্বের গণতন্ত্রের রক্ষক হিসেবে কদাচ দাবিও করেনি। বরং বিশ্বে ''গণতন্ত্র-রক্ষার'' ইজারা এতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেচে নিজের কাঁধে নিয়েছিল। আর, সেই ছুতোয় বিশ্বের নানা দেশে নিজের ইচ্ছেমতো অন্যের স্বাধীনতায় ''হস্তক্ষেপ করা ও হামলা করাটাই'' হয়ে উঠেছে আমেরিকার স্বভাব।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রাষ্ট্রসংঘকে উপেক্ষা করে সাম্রাজ্যবাদী জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবেই আমেরিকা সারা বিশ্বে নিজের আধিপত্য ফলিয়ে এসেছে। এখন আর্থিক সামর্থ্য কমে আসার ফলে, সাধ থাকলেও—সেই সাধ্য আমেরিকার আগের মতো নেই। যার সর্বশেষ উদাহরণ আফগানিস্তান থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসা। কিন্তু, চীনকে সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে যুদ্ধ-পরিস্থিতির দিকে আমেরিকা যে ঠেলে দিচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

রাটক্লিফের প্রবন্ধের নিহিতার্থ ও গুরুত্ব এখানেই যে, মার্কিন চীন বাণিজ্যযুদ্ধ এখন আর নিছক বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যে আটকে থাকবে না তার ইঙ্গিত সেখানে স্পষ্টভাবে রাখা হয়েছে। তা এক যুদ্ধের দিকে শুধু চীনকে নয়, সারা বিশ্বকেই এখন প্রতিদিন একটু একটু করে ঠেলে দিচ্ছে। বিশ্ববাসীর কাছে, ও বিশেষ করে ভারতের কাছে যা অবশ্যই এক দুশ্চিন্তার কারণ। নানা কারণে ভারত হয়তো সেই যুদ্ধে আমেরিকার দাবার ঘুঁটি হয়ে উঠতে পারে। কেননা সরাসরি আমেরিকা চীনকে আক্রমণ করার ঝুঁকি নেবে না। যার প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়ে গেছে।

বিশ্বের রাজনৈতিক অর্থনীতি ও ক্ষমতার রাজনীতি এখন এমন এক নাটকীয় পরিবর্তনের সম্মুখীন যার সম্ভাব্য অভিঘাত একমাত্র প্রাকৃতিক জলবায়ু-পরিবর্তনের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু ভারত সহ অন্যান্য দেশ যে এই সংঘাত ও সংকটকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরছে এমন নয়। জলবায়ু সংকটের মতো, এখানেও কার্যকারণ, ইতিহাস, বিপদ ও ঝুঁকির কথা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই খুব সংক্ষেপে পরিস্থিতির কার্যকারণের ইতিহাস ও বর্তমান সংকটের রূপরেখা এখানে তুলে ধরতে চাইছি।

কোভিড উত্তর বিশ্ব : থুসিডিয়াসের ফাঁদ

বিশ্বায়িত কোভিড মহামারী এখন প্রায় শেষপর্বে পৌঁছে গেছে ও পাল্টে দিয়েছে বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতি। কোভিড উত্তীর্ণ বিশ্ব সম্পূর্ণ আগের চেহারায় কোনদিনই ফিরে যাবে না। পাল্টে যাচ্ছে বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রযুক্তিব্যবস্থা, জীবনযাত্রা ও রাজনৈতিক অর্থনীতি। এই জটিল পরিবর্তনের পূর্ণাঙ্গ ছবিটা এখনও সুস্পষ্ট নয়। এই পরিবর্তনের সূচনাও হয়েছিল অনেক আগে থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের উদ্যোগেই যার সূচনা করেছিল। চীন-মার্কিন সম্পর্কের সঙ্গে পৃথিবীর বর্তমান ও ভবিষ্যত তাই ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।

কোভিড পরিস্থিতিতেও চীনের অর্থনীতি বিশ্বে পুঁজির অর্থনৈতিক ভারসাম্য নিজের অনুকূলে অপ্রতিহত গতিতে বদলে নিয়েছে। বিশ্বায়িত কোভিড মহামারীর মধ্যলগ্নে, ২০২০-২০২১ সাল চিনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল বিশ্বের শীর্ষে। কোভিড শেষ হবার পর যার গতি আরো ত্বরান্বিত হবে। অর্থনীতি ও বাণিজ্যের তথ্য ও পরিসংখ্যান পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেয় যে, বিশ্বের পুঁজিবাদী সম্পদ আহরণ অর্থাৎ global capitalist accumulation এর ভরকেন্দ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্থায়ীভাবে সরে গেছে চীনে। যদিও এই পুঁজিবাদের চরিত্র যথেষ্ট গোলমেলে। একুশ শতকের তৃতীয় দশক এই কারণে অর্থনীতির ইতিহাসে স্থান পাবে। চীন জিডিপির বিচারে আমেরিকার পেছনে বা দ্বিতীয় স্থানে আছে এই বার্তা আসল সত্যকে ঢেকে রাখে। আসলে সত্য হল চীন হয়ে উঠেছে সারা বিশ্বে পুঁজিবাদী সম্পদ তৈরির প্রধান কেন্দ্র।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে অবস্থানে ছিল, যেই শক্তিতে বিশ্বায়িত সাম্রাজ্য হাতের মুঠোয় সে নিয়ে এসেছিল, সেই শক্তির চাবিকাঠি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত ফসকে নিশ্চিত ভাবেই বেরিয়ে গেছে। স্বাভাবিক নিয়মতান্ত্রিক বাণিজ্য অর্থনীতির পথে সেই শক্তি নিজের হাতে ফিরিয়ে আনা আজ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মার্কিন চীন বাণিজ্যযুদ্ধ বাণিজ্যের সংঘাতেই আটকে থাকবে না। বিপদটা সেইখানেই। এক গ্রিক দার্শনিকের নামে—এই পরিস্থিতিকে বলসা হয় থুসিডিয়াস ট্রাপ বা থুসিডিয়াসের ফাঁদ। কোনো সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকটি সাম্রাজ্য উঠে এলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে, এবং সেই যুদ্ধই আনে ক্ষমতায় থাকা সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে। সেই পরিস্থিতি যে আজকে বিরাজ করছে তা রাজনীতি বিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা অনেকেই স্বীকার করছেন। চীনের শিল্প অর্থনীতির সাফল্য হয়ে উঠেছে চীনের বিপদের কারণ।

চীনের এই অর্থনৈতিক পরিবর্তন কিন্তু রাতারাতি ঘটেনি, চোরাগোপ্তা পথেও ঘটেনি। আই এম এফ (IMF) এর পেশ করা হিসাবমত ২০১৩ থেকে ২০১৮ সালে বিশ্বে পুঁজিবাদী সম্পদ সৃষ্টির ২৮ শতাংশ ঘটেছে চীনে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণের বেশি। তাই, এমন নয় যে কোভিড চীনকে এই সুযোগ এনে দিয়েছে। যদিও, কোভিড চীন এই উদ্দেশ্যে তৈরী করেছে—এমন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব আমেরিকার মদতে ফেরি করা হচ্ছে।

ভুললে চলবে না, চীনের অর্থনীতির বর্তমান পরিবর্তনের সূত্রপাত আমেরিকার নিজের উদ্যোগেই ঘটেছিল ১৯৭০ এর দশকে—যখন একাধিক সংকটের সমাপতন এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল। এই সময়ে সামরিক প্রযুক্তিতে অগ্রসর আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে পরাজিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরমাণু অস্ত্র ও বেশকিছু সামরিক প্রযুক্তিতে আমেরিকাকে ছাপিয়ে যায়। মার্কিন পুঁজিবাদী অর্থনীতির মুনাফার হার কমে আসে। অন্যদিকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট শিবির থেকে বিচ্ছিন্ন চীনের অর্থনীতি গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়। চীনে দেখা দেয় অস্তিত্বের সংকট। প্রায় এখনকার উত্তর কোরিয়ার মতো দশায় পৌঁছয় চীন, যার জনসংখ্যা ছিল বিশ্বে বৃহত্তম। এই পটভূমিতে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আঁতাত গড়ে ওঠে হেনরি কিসিঞ্জারের উদ্যোগে। অনেকের কাছেই যা এক হেঁয়ালি বা প্রহেলিকা বলে সে সময়ে মনে হয়েছিল।

আমেরিকার চীন-প্রীতি প্রহেলিকা ও চীনের শিল্পায়ন কৌশল

চীন-মার্কিন প্রহেলিকাময় আঁতাতের অনিবার্যতা বুঝতে রোজা লুক্সেমবুর্গের পুঁজিবাদের সম্পদ সৃষ্টির মৌলিক বিশ্লেষণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। রোজার বিচারে, পুঁজিবাদের টিকে থাকা ও বিকাশের জন্যে অ-পুঁজিবাদী উৎপাদন ও তার পরিমণ্ডল অত্যাবশ্যক। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত মূল্যের প্রয়োগের জন্য অ-পুঁজিবাদী দেশ বাজার হিসেবে কাজ করে, যারা উৎপাদনের উপকরণ বা কাঁচামালের জোগান দেয় এবং সস্তা মজুরের জোগানদার হিসেবেও কাজ করে, যার ফলে পুঁজিবাদী ন্যূনতম মজুরি বজায় রাখার শর্ত পূরণ করা সম্ভবপর হয়। সুতরাং, পুঁজিবাদ যে অ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে বা গ্রাস করে, ঘুরে ফিরে সেই অ-পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ওপরেই কিন্তু নির্ভর করে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব। বিংশ শতাব্দীতে চীন-মার্কিন অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন যার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। যাতে, সহায়ক হয়ে ওঠে চীন ও আমেরিকার নিজের নিজের অস্তিত্বের সংকট।

চীন এই সম্পর্ককে এমন ভাবে চালিত করল, যা ইতিহাসে আগে কখনও দেখা যায়নি। এককথায় বলতে গেলে চীন সুচিন্তিতভাবে পুঁজিবাদী-হীন শিল্পায়নের পথ নিল। চীনের শিল্পায়নে পুঁজিবাদীরা ছিল বিদেশি লগ্নি, অর্থাৎ চিনের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কহীন বিদেশি কোম্পানি। এককথায়, Absentee Capitalists। চীন এক বিপুল সংখ্যক মজুরের ভাণ্ডার হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করল। যা মজুরেরা পুঁজিবাদের সংসর্গে আসেনি, আসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হল। এদের মজুরি যৎসামান্য। বাজার ও বাজারের চাপ থেকেও এরা মুক্ত। ফলে এদের মজুরি বৃদ্ধির চাপ থেকে লগ্নিকারী বিদেশি কোম্পানি বা পুঁজিপতিরাও মুক্ত। যার ফলে স্থিতিশীল মজুরির এক অভাবনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে চীন। এর পরোক্ষ চাপে শুধু আমেরিকা নয়, সারা বিশ্বে, বিশেষত প্রাগ্রসর পুঁজিবাদী দেশে, শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি কমেছে। একুশ শতকের প্রথম দুই দশকে চীনে ১২ কোটি ১০ লক্ষ মজুর, যারা উৎপাদন ও পরিষেবার কাজে যুক্ত, তাদের বিদেশি পুঁজিপতি বা কোম্পানিদের কারবারে সরবরাহ করেছে। রাষ্ট্র বা পার্টি কার্যত তাদের ঠিকাদারে পরিণত হয়েছে।

চোখ মেলে দেখলেই বোঝা যাবে যে শিল্পায়ন ও পরিকাঠামোয় বিপুল বিনিয়োগের মাধ্যমে চীন একদিকে যেমন তুষ্ট করেছে বিদেশি কোম্পানিদের, অন্যদিকে বিনিয়োগকারী কোম্পানিদের হুবহু নকল করে নিজেরা তৈরী করেছে একের পর এক চীনা কর্পোরেট সংস্থা। এই চীনের কর্পোরেট শিল্প সংস্থার পণ্য অত্যন্ত কমদামে সরবরাহ করা হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধের উন্নয়নশীল দেশের বাজারে। যে নিম্নআয়ের বাজার ধরার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কোনটাই চিনে লগ্নিকারী নামিদামি বিদেশি ব্র্যান্ড ও কোম্পানির ছিল না। চীন রপ্তানিকেন্দ্রিক শিল্পায়ন ঘটিয়ে বিশ্বজুড়ে সবধরনের পণ্যের একচেটিয়া উৎপাদক হিসেবে নিজেকে উন্নীত করে ফেলেছে। কর্পোরেট উদ্যোগে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ভেঙ্গেচুরে তার এক সামান্য অংশ এবং পণ্য জোড়া লাগানোর কাজটুকু ভাগ করে দেওয়া হলো বাকি বিশ্বে। এই কাজ সুচারুভাবে করার জন্য জাহাজে কন্টেইনার মারফৎ পণ্য ও যন্ত্রাংশ পরিবহনের নতুন পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হলো।

চীনকেন্দ্রিক উৎপাদন বিন্যাসের এই পর্বে আমেরিকার রাষ্ট্রনেতা ও কর্পোরেটকর্তারা একযোগে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা WHO, IMF বিশ্বব্যাঙ্ক (WB) করনীতি, মাসুল নীতি, এমনভাবে মুক্ত বাণিজ্যের অনুকূলে ঢেলে সাজাল যাতে চীন বিনা প্রয়াসে সারা বিশ্বের পণ্যবাজারের দখল নিতে পারে। সহস্রাব্দের সন্ধিক্ষণে ২০০১ সাল ছিল মার্কিন সহায়তায় চীন পণ্যের বিশ্ববাজার দখল করার তুঙ্গমুহূর্ত। পশ্চিমের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মতো শিল্পায়ন ও পণ্য রপ্তানির বাজার দখলের জন্য যথাক্রমে দেশের ভেতরে ও বাইরে কোনো হিংসাশ্রয়ী যুদ্ধ চীনকে করতে হলো না। যা এক অদ্বিতীয় ঘটনা। এই মহাপরিবর্তন সাধিত হলো দেশের অভ্যন্তরীণ পার্টি-একনায়কত্ব ও বাইরে মার্কিন নেতৃত্বাধীন কর্পোরেট মহলের নিম্নতম মজুরিতে সর্বাধিক মুনাফা সৃষ্টির লোভের সমাপতনে।

পরবর্তীকালে পৃথিবীর অন্য অনেক দেশে ও ভারতেও বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্পায়নের মডেল চালু হলেও—চীনের মতো সাফল্য কেউ অর্জন করতে পারেনি, যেহেতু তাদের পরিস্থিতি ও লক্ষ্য দুই ছিল চীনের থেকে গুণগত ভাবে আলাদা। আর, এই কারণেই ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে কার্যকালের শেষপর্বে উত্তর কোরিয়াকে দিয়ে চীনের বিকল্প তৈরী করতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন।

আত্মঘাতী আমেরিকা

একুশ শতকের শুরুতেই মার্কিন কর্পোরেট সংস্থাগুলি তাদের চীননীতির ভুল বুঝতে পারে, যা সামলে ফেলার কোনো নিয়মতান্ত্রিক উপায় তাদের হাতে ছিল না। কারচুপি করে মার্কিন অর্থনীতির ঘনিয়ে ওঠা সংকট কিছুদিন চেপে রাখা গেলেও — ২০০৮ সালে ব্যাঙ্কিং-বিপর্যয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে

এরপর ৮ পাতায়

বাংলাদেশ'-এর উদ্ভব ও দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষমতাবিন্যাসের রূপান্তর

৩-এর পাতার পর

এই ঘটনায় সোভিয়েত ইউনিয়নও রাজনৈতিক-কূটনৈতিক প্রভাবের প্রেক্ষিতে যথেষ্টই লাভবান হয়েছে। যে রকম সাজো সাজো রবে আমেরিকা ও চিন পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়িছেল—এক ধাক্কায় তা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বলয় অনেকটাই প্রসারিত ও সুরক্ষিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা ইন্দো-সোভিয়েত মৈত্রী বন্ধনটা অনেক দৃঢ়তর হয়েছে। আমরা নিশ্চিত অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়াদিল্লীর শাসকগোষ্ঠীর উপর অধিকতর আর্থরাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করবে।

ইতিমধ্যেই মস্কোপন্থী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি অর্থাৎ সি পি আই ভারত সরকারের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, তার যথেষ্ট ইঙ্গিত প্রকাশ্যে এসেছে। আসন্ন বিধানসভা- লোকসভা নির্বাচনগুলিতে শাসক কংগ্রেস এবং সি পি আই-এর জোটের সম্ভাবনা অচিরেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই ধরনের শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে সি পি আই-এর সখ্য এবং জোটের সম্ভাবনা ও বৃহত্তর পরিসরে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর প্রভাবে শাসক কংগ্রেসের একটি তথাকথিত প্রগতিশীল ভাবমূর্তির পক্ষে বামপন্থীদের একাংশের হাতে যথেষ্ট যুক্তির ভাণ্ডার নির্মিত হবে।

এই অবস্থায় দেশের বিরোধী বাম দল এবং বিপ্লবী মার্কসবাদীদের নিজস্ব রাজনৈতিক রণকৌশল নির্ধারণের প্রেক্ষিতে যথেষ্ট শ্রেণিসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই ভারতের বুর্জোয়া শাসকদের শ্রেণিচরিত্র বিস্মৃত না হয়ে, দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির ও তাদের তাঁবেদার শাসকগোষ্ঠীর প্রগতিশীল মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন ও শ্রেণি সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে।

কয়েকটি প্রশ্নের জবাব খুঁজে নিতে হবে

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় নতুন ক্ষমতার অক্ষ তথা বিন্যাস আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং বৈদেশিক নীতিকে কিভাবে প্রভাবিত করবে? কিভাবেই বা প্রভাবিত হবে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি? নতুন ধরনের রাজনৈতিক বিন্যাসে ভারতের ভূমিকাই বা ভবিষ্যতে কি হবে? সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীর ফলে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী কি তথাকথিত 'জাতীয় স্বার্থে' নিজেদের স্বতন্ত্র ভূমিকা প্রদর্শন করতে পারবে? পশ্চিম গোলার্ধের উন্নত পুঁজিবাদী দেশ এবং চিনের সঙ্গে সম্পর্কই বা কি রকম হবে? ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তি কিভাবে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতাহীন তথাকথিত 'জোট নিরপেক্ষ' ভূমিকার সহায়ক হয়ে ভারতীয় পুঁজিপতিদের কাছে বিভিন্ন সুপারপাওয়ারের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার সহায়ক হবে? বাংলাদেশ, শুধুমাত্র বাংলাদেশকে নিঃশর্তে সমর্থন ও চিরকালের জন্য মিত্র রাষ্ট্র রূপে ভারত কি মেনে নিতে পারবে? ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আরও অনেক স্বাধীন রাষ্ট্র আছে, তাদের সঙ্গে নতুনভাবে এতদঞ্চলে শক্তিধর হয়ে ওঠা ভারতের ভূমিকা কি হবে?

এ রাজ্যে কৃষিজীবীদের দুর্দশা অফুরন্ত

কৃষিপণ্য বা খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঠামোগত সংকট বিশ্বব্যাপী প্রকাশ্য আলোচনার প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে ২০১৮-১৯ সালে। একদিকে ক্রমাগত খাদ্যাভাব আর অন্যদিকে বহু কৃষিজীবি মানুষ কৃষিক্ষেত্র পরিহার করে অন্য কিছু করে জীবনধারণের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। যাঁরা সর্বসাধারণের জন্য খাদ্যের সংস্থান করেন অথবা সেই কাজ করে নিজেদের সংসার প্রতিপালন করেন, তাঁদের মধ্যে এই প্রবণতা অবশ্যই গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। বেশ কিছুকাল যাবৎ তাঁরা অস্তিত্ব সংকটে দিশাহারা হয়ে উঠছেন। এসব প্রবণতা বহু বছর ধরেই চলেছে।

ভারতে ২০১১-১২ সালে একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে কৃষি নির্ভর পরিবারগুলির অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েরা কৃষিকাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। প্রায় ২৮ শতাংশ যুবক বা তরুণ সেনাবাহিনীতে চাকুরি করতে উৎসাহী। ১২ শতাংশ প্রযুক্তি শিক্ষালাভে উৎসুক। ভারতের কৃষি উৎপাদনে মেয়েদের অংশগ্রহণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের অন্য বহুদেশেই বিপুল সংখ্যক মহিলা কৃষিকাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

ভারতে কৃষি পরিবারের নারী সন্তানদের পঁচিশ শতাংশেরও বেশি শিক্ষকতার পেশাকে বেশি উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে করে এবং সেই লক্ষ্যেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সচেষ্ট। দেশের নানা প্রান্তে অবস্থিত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রদের একটি বড় অংশ পেশা হিসেবে কৃষিকর্মে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে এবং এই সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যাও তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে যেতে শুরু করেছে।

২০১১ সালেও লক্ষ করা গেছে যে প্রায় সত্তর শতাংশ তরুণ বা যুবক যুবতী গ্রামীণ ভারতেই বসবাস করেন। তাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জীবিকায় আংশিকভাবে যুক্ত থাকলেও অধিকাংশই অন্যান্য অকৃষি কাজে নিযুক্ত থাকাকেই বেশি লাভদায়ক বলে গণ্য করেন। বয়স্ক মানুষদের কাছে গত্যন্তর না থাকায় কৃষিক্ষেত্র আঁকড়ে থাকতেই তারা বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের মধ্যেও অনেকেই কৃষিকাজের পাশাপাশি অকৃষি কাজ করে কিছুটা বেশি অর্থ উপার্জনে সচেষ্ট। এই চিত্রটি শুধুমাত্র ভারতেই নয়, অন্যান্য অনেক দেশেই এমন অবস্থা বিরাজ করছে। উদাহরণ হিসেবে জাপানকে উল্লেখ করা যায়। এই দেশে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজ ছেড়ে দেবেন বলে আশঙ্কা।

কৃষিভিত্তিক জীবিকা অর্জনের সুযোগ সীমিত হতে হতে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে চলেছে যে, ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা এক কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়বে। ভারতে ঐতিহ্যগত ভাবে বেশির ভাগ মানুষই গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করেন। বর্তমানে ভীতিজনকভাবেই লক্ষ করা যাচ্ছে যে, দ্রুত ও অপরিকল্পিত ভাবে নগরায়ণ হবার ফলে বহু সংখ্যক গ্রামীণ মানুষ জীবিকার সন্ধানে গ্রামীণ জীবন থেকে শহরে বা নতুন করে গড়ে ওঠা আধা শহরগুলিতে ভিড় জমাচ্ছেন। সেখানেও কাজের সুযোগ যথেষ্ট কম বা ইদানিংকালে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বর্তমান সরকারের অযোগ্যতার জন্যই অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে ব্যাপক সংকট দেখা দিয়েছে। ফলে একদিকে গ্রামীণ পরিসরে জীবিকার সুযোগ যথেষ্ট কমে গেলেও অন্যান্য অকৃষি ক্ষেত্রগুলিতে উপার্জনও সম্ভব হচ্ছে না। ফলত এক অতীব দুর্বিষহ সামাজিক পরিস্থিতি প্রতিদিন মানবজীবনের সংকট গভীরতর করে চলেছে। কর্মহীনতার সমস্যা ব্যাপক।

একটি মারাত্মক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া জরুরি। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের কোনও সুযোগ আছে কী? ভারতের মতো একটি অতিজনবহুল দেশে এই প্রশ্নটি সমধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হওয়া জরুরি। দেশের সরকার বা অধিকাংশ রাজ্য সরকারগুলি গতানুগতিক কিছু চিন্তার বাইরে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু ভাবতে পারছে বলে মনে হয় না। আসলে সবকিছুই কেন্দ্রীয় স্তরে সিদ্ধান্ত হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেগুলি কোনও অঞ্চলভিত্তিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মনে না রেখেই রাজ্যগুলির ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এই অবস্থাটি শুধু ডাবল ইঞ্জিনের সরকারগুলির ক্ষেত্রেই বাস্তব নয়, প্রায় সব রাজ্যেই চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহযোগিতা লাভে এছাড়া গত্যন্তরও নেই।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আতঙ্কজনক সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে পুঁজিবাদী আর্থ ব্যবস্থা। সংকট থেকে বাঁচতে এরা নয়া উদারবাদী প্রকল্পগুলির ব্যাপক বাস্তবায়নে তারা সমধিক উৎসাহী। জাতীয় বা আঞ্চলিক ভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করলে আগ্রাসী পুঁজির স্বার্থপূরণ হতে পারে না। সুতরাং

এরপর ৮ পাতায়

স্মরণসভা

গত ২ জানুয়ারি বালুরঘাটে জয়েন্ট কাউন্সিল ভবনে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা এন.এম.টি.পি-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত প্রশান্ত দে (বাবলু)'র স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল। উক্ত স্মরণসভায় বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। প্রয়াত প্রশান্ত দে'র প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক দিয়ে সংগঠনের প্রায় সকল সদস্য সদস্যরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এই স্মরণসভায় পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি পুষ্প স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

এছাড়া প্রয়াত দে'র স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সাংগঠনিক কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির পক্ষে শ্রমজীবী আন্দোলনে নেতা কম. বিমল সরকার, N.M.T.P.A 'র জেলা সভাপতি স্বপন দাশগুপ্ত, সংগঠনের জেলা সম্পাদক পঙ্কজ সরকার, সংগঠনের সদস্য অমরনাথ গোস্বামী প্রমুখ, পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে কম. কনক রায় এবং কম. নারায়ণ ভৌমিক প্রমুখ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জয়েন্ট কাউন্সিলের জেলা সম্পাদক কম. জয়ন্ত চক্রবর্তী।

তেলেঙ্গানায় পি এস ইউ রাজ্য সম্মেলন

পিএসইউ সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন

দীর্ঘ দুই বছরের কাছাকাছি সময় গোটা বিশ্বের সাথে সাথে আমাদের দেশ ও করোনা অতিমারির মুখোমুখি। এই সময়ে আমাদের দেশের প্রায় আশি শতাংশ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত নানাভাবে। অন্যদিকে কর্পোরেট পরিচালিত শাসক গোষ্ঠী লকডাউন-করোনাকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে কর্পোরেট আগ্রাসন নামিয়ে এনেছে দেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, কৃষিক্ষেত্র থেকে শুরু করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি সবকিছুর ওপর। এই সময়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বাজারের হাতে তুলে দিতে নয়া শিক্ষানীতির নামে গভীর ষড়যন্ত্রের নীল নকশা এঁকেছে কেন্দ্রের সরকার। আমরা পি এস ইউ ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণার পর থেকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি। এমতাবস্থায় আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সংগঠনের সর্বভারতীয় কনভেনশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশজুড়ে নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে এই কনভেনশন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তার আগে সম্ভবমতো কারণে বিভিন্ন রাজ্যে সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে গত ২৯-৩০ ডিসেম্বর পি এস ইউ-এর তেলেঙ্গানা রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল নিজামাবাদ শহরে। সম্মেলনের শুরুতে পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সুসজ্জিত মিছিল নিজামাবাদ শহর পরিক্রমা করে এন ই পি-২০২০ বাতিলের দাবিতে। নিজামাবাদ শহরের একাংশকে সাজিয়ে তোলা হয় সংগঠনের পতাকায়। তারপর সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা। এরপর সংগঠনের প্রাক্তন নেতৃত্ব কমরেড ক্ষিতি গোস্বামী, অবনী রায় সহ এই সময়ের মধ্যে প্রগতিশীল আন্দোলন, সমাজের বিশিষ্টজন, কোভিডের কারণে যারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয় রাজীব গান্ধি অডিটোরিয়াম হলে। তেলেঙ্গানা রাজ্যের সাতটি জেলা থেকে ১৬৮ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিল। সম্মেলনের প্রারম্ভিক ভাষণ দেন তেলেঙ্গানা রাজ্যের আর এস পি সম্পাদক কম. জানকি রামুলু। এছাড়াও এস এফ আই, এ আই এস এফ, এ, আই এস বি তেলেঙ্গানা রাজ্যের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের শেষে আলোচনা করেন পি এস ইউ-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরড নওফেল মহাঃ সাফিউল্লা। তার দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্যে তিনি বলেন, তেলেঙ্গানা রাজ্যে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস এবং সেই আন্দোলনে সে রাজ্যের ছাত্রদের ভূমিকা, সেই সাথে তিনি বর্তমান সময়ে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের কর্মী হিসেবে আমাদে কি করনীয় এবং কেন নয়া জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সম্মেলন শেষে ১৫ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। তেলেঙ্গানা রাজ্য সম্পাদক নির্বাচিত হয় কম. কিরন কুমার ও সভাপতি নির্বাচিত হয় কম. অরুণ কুমার। আগামী দিনে সংগঠনের লক্ষ্য ঘোষণা করে সম্মেলনের সভাপতি কম. জওয়ালা সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা

প্রয়োজন লক্ষ্যে অবিচল আপসহীন নেতৃত্ব

অশোক ঘোষ

সংসদীয় গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় মদগর্বী মূঢ়সম আস্ফালন শেষ কথা বলে না। ইতিহাসের সাক্ষ্য হলো কোনও রাষ্ট্রই ক্ষমতা নয়, জনসাধারণই শেষ কথা বলে। দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী কোনও শাসক দলের নেতৃত্বই ক্ষমতায় থাকার সময় সহজ কথাটা বুঝে উঠতে পারে না। ক্ষমতার ঔদ্ধত্যই ক্ষমতার বিনাশ নিশ্চিত করে। যে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক দলকে শাসন ক্ষমতায় বসায় তারাই আবার ক্ষমতার অলিন্দ থেকে তাদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়। রাজনৈতিক উত্থান ও পতনের ইতিহাস অনুধাবন করলে প্রধানমন্ত্রীর অনেক আগেই পরিস্থিতি সচেতন ও মানবিক হওয়া উচিত ছিল।

কর্পোরেটের প্রতি দায়বদ্ধ মোদি সরকার ঔদ্ধত্য, দম্ভ ও অহংকারের আস্ফালনের কারণেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে আলোচনার পথ বর্জন করলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ব্যবধান বেড়ে চলে। সরকার যত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোর দেখাতে চেষ্টা করে, ততই মানবিক মুখ বিলীন হয়ে যায়। দেশের মানুষ ভুলে যান নি সেই দৃশ্য, রেললাইনের ওপর পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন রুটির টুকরো, আর মৃত পরিযায়ী শ্রমিকদের দেহ। তারপরেও দেশের মন্ত্রীরা এক মিনিটের জন্য শোকজ্ঞাপন করেন নি।

নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ক্রমাগত জয়ের স্বাদ পেতে পেতে পরাজয় কল্পনাও করেননি। এবার তাঁকে পরাজয় প্রত্যক্ষ করতে হলো। সামনেই পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ সহ ৫ রাজ্যের ভোট। কয়েকদিন আগে দেশব্যাপী ৩৬টি বিধানসভা, ৪টি লোকসভার উপনির্বাচনে বিজেপির ভোট কমায় সিঁদুরে মেঘ দেখা দিয়েছে। আজ বিজেপির অতি বড় সমর্থক হোক বা সাধারণ মানুষই হোক বাজারে গিয়ে আচ্ছে দিন কেউই খুঁজে পাচ্ছেন না। কৃষক আত্মহত্যার মর্মান্তিক সংখ্যায় বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের মানুষকে চমকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর হিসেব অনুসারে ঋণের দায়ে ২০২১ সালে ১০,৬৭০ জন কৃষক আত্মহত্যা করেন।

এই কৃষক আন্দোলন থেকে অর্জিত শিক্ষা আমাদের অভিজ্ঞতা পূর্ণ করবে। কৃষক আন্দোলনের সফলতা যেমন এক নতুন অভিমুখের সৃষ্টি করেছে, তেমনই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে শ্রমিক সংগঠনসমূহ। পথের দিশা ঠিক থাকলে শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলন সমস্ত বাধা কাটিয়ে সরকারকে বাধ্য করতে পারে জনবিরোধী আইন প্রত্যাহারে। এই শিক্ষা থেকেই যে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী শ্রম কোড সংসদে আলোচনার সুযোগ না দিয়ে অনুমোদন হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে সরকারকে বাধ্য করতে হবে আইন প্রত্যাহারে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ শ্রমজীবী জনতার আন্দোলন লক্ষ্যে অবিচল থেকে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের নেতৃত্বে সক্ষম হবে, সরকারকে বাধ্য করবে শ্রম কোড প্রত্যাহারে। নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন ও সাহসী নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ পথেও এ কাজ করা সম্ভব।

নয়া উদারবাদী অর্থনীতি অনুসরণ করার পর শাসন ক্ষমতায় যারা এসেছে, তারা সকলেই অর্থনৈতিক সংস্কারের নামে কার্যত দেশের প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটাই তুলে দিতে চেয়েছে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশে পুঁজি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করতে শ্রম আইন সংশোধনেই ছিল সরকারের গুরুত্ব। কেন্দ্রের ও রাজ্যের সব মিলিয়ে ১৪০টি শ্রম আইনের খোলনলচে বদল করে চারটি শ্রমকোডে রূপান্তরিত হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি বর্জন করে, এমনকি, সংসদে আলোচনার পথ পরিহার করে শ্রমকোড গৃহীত হয়েছে। শ্রমের বিষয়টি সংবিধানের যৌথ তালিকায় থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গেও কেন্দ্রের সরকার আলোচনা করেনি। গত ছয় বছর ভারতীয় শ্রম সম্মেলন (ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স) অনুষ্ঠিত হয়নি, যেখানে শ্রম সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা হতে পারত।

গত এক দশক ধরেই দেশের সরকার শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন করেছে। শ্রমিক সংগঠন সমূহের রাষ্ট্রীয় মঞ্চ দেশব্যাপী সংগ্রাম গড়ে তুলেছে। বরোর চিঠিপত্র দেওয়া, আলোচনার আহ্বান জানানো, ধর্মঘট সংগঠিত করা, সংসদ অভিযান, আইন অমান্য ইত্যাদি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহ নিরলসভাবে করে গিয়েছে। দেশে কোনও জাতীয় বেতন নীতি নেই। আর্থিক সমৃদ্ধির সরকারি ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও ছোট ব্যবসায়ী ও দোকানদার, ফেরিওয়ালা, সাধারণ কৃষক, হতভাগ্য কর্মহীন শ্রমিক, অনাহারে থাকা পরিযায়ী শ্রমিক আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। দেশের ৪০ কোটি শ্রমজীবী মানুষ অনাহার, অর্ধাহারের মুখোমুখি। কর্পোরেট পুঁজির হাতে দেশের যাবতীয় সম্পদ তুলে দিয়ে সমগ্র অর্থনীতির বেসরকারিকরণের পথে হাঁটছে সরকার। পাশাপাশি অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলিও বেসরকারি হাতে সমর্পণ করতে চালু হয়েছে 'অ্যাসেট মনিটাইজেশন পাইপলাইন।'

করোনায় বেআব্রু সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চরম দুর্বলতা। মোদি সরকার আলো জ্বালিয়ে, তালি বাজিয়ে ভাইরাস দূর করার নিদান দিয়েই দায়িত্ব সেরেছে। ভারতে প্রস্তুত অক্সিজেন অন্য দেশে রফতানি হয়েছে। আর এ বছরে অক্সিজেনের অভাবে লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর প্রাণহানি হয়েছে। ভারতে করোনায় প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। টিকাকরণ নিয়ে নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচার করে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। অক্টোবরের মধ্যে টিকা পেয়েছেন মাত্র ২১ শতাংশ দেশবাসী। আঠারো বছরের কম বয়সীদের টিকাকরণের ব্যবস্থা আজও হয়নি।

বিগত সাত বছরে দেশের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা চরম অবহেলিত। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বরাদ্দ জিডিপি'র মাত্র এক শতাংশ। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের বিচারে ১৮৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৭৯তম। লজ্জাজনক।

বাড়ছে উজ্জ্বল ইন্ডিয়া ও অন্ধকার ভারতের বিভেদ। আর্থিক বৈষম্যের বিচারে বিশ্বে ভারতের স্থান ষষ্ঠ। করোনায় দেশের ৯৭ শতাংশ মানুষ আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত, অপরদিকে দেশের ১৩ জন ধনকুবেরের সম্পদ ১ লক্ষ কোটি টাকা বা তার বেশি। প্রতিনিয়ত কর্পোরেট কোম্পানিগুলির সম্পত্তি বাড়ছে। ২০২১ সালের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ১১৬টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০১তম। নির্লজ্জ মোদি সরকার।

করোনায় দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ২৩ কোটি বেড়েছে। মধ্যবিত্তদের মধ্যে এক বিপুল সংখ্যক মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে চলে গেছেন। আয়ের ব্যবধানে (ইনকাম গ্যাপ) বিচারে দেশের করুণ অবস্থা। গত বছরেই ৬৬ শতাংশ শ্রমিক-কর্মচারীর বেতন কমেছে। এই বিকৃত ব্যবস্থা বেড়েই চলেছে।

২০২০-২১ সালে কর্পোরেট ট্যাক্স ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে করা হয় ২৫.১৭ শতাংশ। অপরদিকে বেড়ে চলেছে পরোক্ষ কর, ভুগছেন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা।

পেট্রোল ডিজেলের দাম লাগামছাড়া বেড়েই চলেছে। পরিবহণ খরচ বাড়ছে। জিনিসপত্রের দামও অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমেই চলেছে।

মোদি সরকারের আমলে চলছে অবাধ বেসরকারিকরণ, জলের দরে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও দেশের সম্পদ বিক্রি। রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, বিমান, টেলিকম থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রেও চলছে নির্বিচার বেসরকারিকরণ। বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে সুযোগ করে দিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে রুগ্ন করে দেওয়া হচ্ছে। বিএসএনএল, ওএনজিসি, এলআইসি'কে রুগ্ন করা হয়েছে। দেশের প্রতিরক্ষার সঙ্গেও আপস করে চলেছে কর্পোরেট দালালরা। রাফায়েলের বরাত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হ্যালের বদলে দেওয়া হচ্ছে অনভিজ্ঞ আম্বানি গোষ্ঠীকে। মহাকাশ গবেষণা থেকে শুরু করে বিভিন্ন গবেষণায় কর্পোরেট প্রভাব বাড়ছে। সিএসআইআর, ডিএসটি'র মতো গবেষণামূলক সংস্থার অর্থ বরাদ্দ কমিয়ে আম্বানির জিও ইনস্টিটিউটকে ১০০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। বিএসএনএলকে দুর্বল করে জিও'র ব্যবসা বাড়ানো হচ্ছে।

ঐক্যবদ্ধ ও ঐকমত্যের কৃষক আন্দোলন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সামনে সংগ্রামের প্রেরণা। শ্রমিক সংগঠন সমূহের নেতৃত্বকে কলকারখানা সহ দেশের প্রান্তে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে হবে। বেসরকারিকরণের ধাক্কা কত ভয়াবহ তা সাধারণ শ্রমিকশ্রেণি এখনও বুঝে উঠতে পারেনি। শ্রমিক সংগঠন সমূহের নেতৃত্বের মধ্যে বোঝাপড়াও যথেষ্ট নয়। ঐক্য গড়ে তুলতে হবে শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমিকের।

দেশে কৃষিজীবী মানুষের সংখ্যা শ্রমজীবী মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলের কৃষকরা যেভাবে দিল্লিতে এক বছর অবস্থান করতে পারেন, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত শ্রমজীবী মানুষ সেভাবে হয়তো অবস্থানে সামিল হতে পারবে না। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিক শ্রেণির সেই পথে নামার সম্ভাবনা নিশ্চিত করতে হবে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহকে। স্থিতাবস্থার হাত ধরে চলা আন্দোলন আর মানসিকভাবে আপসপন্থী নেতৃত্ব এই কাজ করতে পারবে না।

সরকারি ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলন শুধুমাত্র আর্থিক লাভ-লোকসানের হিসেবের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণের সম্পত্তি কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক প্রতিরোধে নামতে হবে। আন্দোলন তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র ফেসবুক ও ট্যুইটার নির্ভর আন্দোলন করে সরকারকে নতি স্বীকার করানো যায় না, এর জন্য প্রয়োজন মাটিতে নেমে সাধারণ জনতার হাতে হাত মিলিয়ে গণ আন্দোলন করা। কারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ক্ষমতার কোনও বিকল্প নেই।

ইতোমধ্যেই ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সমূহের ও সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতৃত্ব সহমত হয়েছেন একসঙ্গে শ্রম কোড প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করার আন্দোলন গড়ে তুলবেন। সাহসী ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিচল আপসহীন নেতৃত্বই পারবে সরকারকে নীতি বদলে বাধ্য করতে।

২৩ এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০-এ সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ১১ নভেম্বর ২০২১-এ যন্তর মন্তরে শ্রমিকদের একটি জাতীয় কনভেনশনের আয়োজন করে। কনভেনশনে মোদি সরকারের কর্পোরেটপন্থী, জনবিরোধী, শ্রমিক-বিরোধী এবং কিষাণ-বিরোধী নীতিগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। কনভেনশন সর্বসম্মতিক্রমে সংসদের বাজেট অধিবেশনে সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির বিরোধিতা করে এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ১২ দফা দাবি-সনদ নিষ্পত্তির দাবিতে দুই দিনের সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেই। এরপর কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি আলোচনা করে সাধারণ ধর্মঘটের তারিখ চূড়ান্ত করেছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি একটি বিবৃতি জারি করেছে, ঘোষণা করেছে যে, ২৩ এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২-এ দুই দিনের সাধারণ ধর্মঘট হবে।

দাবির সনদ

(১) শ্রম কোড বাতিল করা।

(২) সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার ফার্ম আইন বাতিলের পর ৬ দফা দাবি মেনে নেওয়া।

(৩) যে কোনও প্রকার বেসরকারিকরণ এবং বিলগ্নিকরণ বন্ধ করা।

(৪) আয়কর প্রদানকারী নয়, এমন পরিবারকে প্রতি মাসে ৭,৫০০ টাকা আয় নিশ্চিত করা ও খাদ্য প্রদান করে সহায়তা করা।

(৫) ১০০ দিনের কাজের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা এবং শহর এলাকায় কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পের সম্প্রসারণ।

(৬) সকল অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা।

(৭) অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, মিড ডে মিল এবং অন্যান্য প্রকল্প কর্মীদের জন্য বিধিবদ্ধ ন্যূনতম মজুরি এবং সামাজিক নিরাপত্তা।

(৮) মহামারীর মধ্যে জনগণের সেবা করা ফ্রন্ট লাইন কর্মীদের জন্য যথাযথ সুরক্ষা এবং বিমা সুবিধা।

(৯) জাতীয় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সম্পদ কর ইত্যাদির মাধ্যমে ধনীদের কর আরোপের মাধ্যমে কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক ইউটিলিটিগুলিতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

(১০) পেট্রোলিয়াম পণ্যের আবগারি শুল্কের উল্লেখযোগ্য হ্রাস এবং মূল্যবৃদ্ধি রোধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১১) চুক্তি কর্মী, প্রকল্প কর্মীদের নিয়মিতকরণ এবং সবার জন্য সমান কাজের জন্য সমান বেতন।

(১২) এনপিএস বাতিল এবং পুরাতন পেনশন পুনরুদ্ধার, কর্মচারীদের পেনশন প্রকল্পের অধীনে ন্যূনতম পেনশন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা।

আসানসোল পৌর নিগমের নির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত আর এস পি প্রার্থীতালিকা

১.	৫২ নং ওয়ার্ড	— কম. সুচিত্রা গুপ্ত
২.	৫৪ নং ওয়ার্ড	— কম. অরুণ মাজি
৩.	৫৬ নং ওয়ার্ড	— কম. রাণু বাগ
৪.	৬৯ নং ওয়ার্ড	— কম. দেবব্রত অধিকারী
৫.	৮২ নং ওয়ার্ড	— কম. নূরী পরভীন
৬.	৮৩ নং ওয়ার্ড	— কম. আসগর আলী

শিলিগুড়ি পৌর নিগমের নির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত আর এস পি প্রার্থীতালিকা

১.	১ নং ওয়ার্ড	— কম. বিশ্বজিৎ রায় (চুন্নু)
২.	৩ নং ওয়ার্ড	— কম. ছন্দা গোস্বামী সরকার

Vol. 68 Issue No. 42 শনিবার ১৫ জানুয়ারি, ২২ জানুয়ারি ২০২২ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

মার্কিন চীন বাণিজ্যযুদ্ধ কি প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত

৫-এর পাতার পর

সারা বিশ্বের পুঁজিবাদী কর্পোরেট অর্থনীতির ভিত্তিমূলে আঘাত করলো। শেষপর্যন্ত, রাষ্ট্রের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র প্রধান প্রধান আর্থিক প্রতিষ্ঠানদের দেউলিয়া দশা থেকে মুক্তি অর্জন সম্ভব হলেও—আমেরিকা সহ পশ্চিমের দেশগুলিতে শিল্পায়নের বিস্তার ও শ্রমজীবি মানুষের মজুরি বৃদ্ধি মারফৎ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার উপায় কার্যত তাদের হাতে ছি না। কেননা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা তো প্রধানত রয়েছে চীনে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কারখানা ও নির্মাণ শিল্পের যন্ত্রপাতি বা মেশিন টুলস, ইলেকট্রনিক পণ্য, আসবাব, জামাকাপড় ইত্যাদির বিক্রি সেই থেকে কমেছে ও সংকুচিত হয়ে আসছে। অসাম্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ফলে এই স্থায়ী অর্থনৈতিক সংকট একের পর এক রাজনৈতিক ও বর্ণবৈষম্য সহ আরো নানা সামাজিক সংকট তৈরী করছে। যার প্রভাবে দৃশ্যত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হতে পারছে ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর মতো কপট মিথ্যেবাদী। তথাকথিত মার্কিন স্বপ্ন (American Dream) এবং missionary for democracy বা গণতন্ত্রের সাধক প্রচারক হিসেবে নিজেকে জাহির করার মার্কিন স্বভাব এখন হওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন তেন প্রকারে চীনকে কোণঠাসা করা ও তার অর্থনীতিকে ধ্বংস করা এখন হয়ে উঠেছে আমেরিকার প্রধান সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তো বটেই, এমনকি বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও মুখ্য-কর্মসূচি।

ঘুমন্ত ড্রাগনকে খুঁচিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে

শিল্পায়িত অত্যাধুনিক এক জাতীয়তাবাদ আশ্রয়ী সর্বগ্রাসী প্রভুত্ববাদী রাষ্ট্র চীন নিজেও যে সবরকম সংকট থেকে মুক্ত এমন নয়। চীনে দুর্নীতি ও অসাম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশের দিকে তাকালে দেখা যায় লাগামহীন প্রদূষণ ও বাস্তুতান্ত্রিক ভঙ্গুরতা। পণ্য ও নির্মাণের ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত উৎপাদন উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। নানা ধরনের সামাজিক অশান্তিও মাথা চাড়া দিচ্ছে। যদিও রাষ্ট্রীয় নজরদারি ও দমননীতির ফলে, আমেরিকার সবরকম উস্কানি সত্ত্বেও তা বৃহৎ আকারের প্রতিবাদী ও হিংসাশ্রয়ী রূপ নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। আমেরিকার মদতে উঘুর অঞ্চলে ইসলামকেন্দ্রিক দাঙ্গা লাগিয়ে দেবার প্রয়াস ও তা নিয়ে ঘোঁট পাকানো, পাকিস্তান ও ইরানের সঙ্গে চীনের কৌশলগত সুসম্পর্কের কারণে সফল হবার সুযোগ এখনো পায়নি।

তাই, আমেরিকার হাতে আছে গুটি কয়েক তাস, যা উল্টে পাল্টে খেলা শুরু হয়েছে। প্রথমটি জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে নিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে সমুদ্র যুদ্ধ ও অবরোধ তৈরির প্রয়াস। কিন্তু এই সমুদ্রপথে যেহেতু বিশ্ববাণিজ্যের ধমনী হিসেবে কাজ করে তাই এখানে চীনকে আঘাত করা অত্যন্ত ঝুঁকির কাজ। দ্বিতীয়টি, তাইওয়ানকে নিয়ে। কিন্তু, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মার্কিন-চীন সহযোগিতা চুক্তির প্রাথমিক শর্ত ছিল তাইওয়ান ও মূলভূখণ্ডের চীনে একটাই দেশ, একটাই চীন তা স্বীকার করা। সেই চুক্তির খেলাপ করলে আমেরিকা নিজেই আন্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গকারী খলনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রমাণিত করবে। আমেরিকার হাতের তৃতীয় তাস ভারত, যার সঙ্গে চীনের সীমান্ত যুদ্ধ ও সীমান্ত বিবাদ বিদ্যমান ও সহজেই বাড়িয়ে তোলা সম্ভব।

শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, যুক্তরাজ্য সহ অস্ট্রেলিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশের সম্মিলিত রাষ্ট্রশক্তির ভারতকে খুঁচিয়ে চীনের ওপর চাপ সৃষ্টিতে সায় আছে। এর ঝুঁকি সম্পূর্ণ ভারতের ওপরেই বর্তাবে। ভারতের মোদি সরকার এই ঝুঁকি নিতে দ্বিধান্বিত। তারা গর্জনে যত রাজি, (মিসাইল) বর্ষণে ততো নয়। চীন যদিও যুদ্ধের সবরকম সম্ভাবনার জন্যই তৈরী। ভবিষ্যত কোনদিকে গড়াবে, যুদ্ধ না যুদ্ধসম-তপ্ত রাজনীতি তা নির্ভর করবে অনেকগুলি বিষয়ের ওপর। এদের মধ্যে আছে, সামরিক ও প্রযুক্তিগত মার্কিন-চীন ভারসাম্য; (২) দক্ষিণ চীন সাগরে সামরিক আধিপত্যের প্রতিযোগিতা এবং অবশ্যই (৩) চীনের আর্থিক সাফল্য ধরে রাখার ক্ষমতা।

এ রাজ্যে কৃষিজীবীদের দুর্দশা অফুরন্ত

৬-এর পাতার পর

সাধারণ মানুষের জীবনধারণের প্রসঙ্গটি একেবারে গৌণ হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদ বাঁচলেই পৃথিবী বাঁচবে, ভাবখানা তেমনই!

কৃষিপণ্য বাজারজাত করতে পারলে হয়তো প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের জীবনের সমস্যা কিছুটা লাঘব হতে পারে। এ প্রসঙ্গে ২০০৪ সালে বামপন্থী দলগুলির চাপে প্রথম ইউ পি এ সরকার ড. এম এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে যে কৃষি কমিশন নিয়োগ করেছিল তার পরামর্শগুলি রিপোর্ট আকারে সরকারের কাছে ২০০৬ সালে জমা পড়েছিল। তৎকালীন ইউ পি এ সরকারও এ প্রসঙ্গে কোনা তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়নি। বর্তমান সরকারের কাছে সদর্থক কিছু আশা করাও নিতান্ত বাতুলতা।

নরেন্দ্র মোদি প্রথম থেকেই মিথ্যা দাবি করে চলেছেন যে তাঁর শাসনকালে এমন কৃষি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যে কৃষকদের উৎপাদন ও উপার্জন দ্বিগুণ হয়েছে। সর্বৈব মিথ্যা দাবি। এমন দাবির অসত্যতা প্রমাণ করেছে ভারতের ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন। মোদি লজ্জাশরম হীন। এখন অবশ্য নাকঘষা খেয়ে তেমন অলীক দাবি করা থেকে বিরত থাকছেন। কতদিন থাকবেন, বলা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গের মোদি স্যাঙ্গাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। এই রাজ্যে প্রায় প্রতিনিয়ত কৃষক আত্মহত্যার দুর্বহ সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। অতীতে, বাম আমলে এসব আদৌ ছিল না।

মোদির মতোই জনসমক্ষে বিলকুল মিথ্যা দাবি করতে মমতা ব্যানার্জীর কোন জুড়ি নেই। এ বলে আমায় দ্যাখ তো ও বলে আমায়! উভয়েই পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন-এর একান্ত অনুগত প্রয়োগকারী। পশ্চিমবঙ্গে লাভজনক দামে কৃষিপণ্য ক্রয় করার সরকারি পরিকাঠামোটিই বরবাদ হয়ে গেছে। বিগত দশ বছরে বাগাড়ম্বর হয়েছে বিস্তর। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল কেনার জন্য অনেকগুলি কৃষি মান্ডি নির্মিত হয়েছে। সেগুলির নির্মাণে সরকারের কোষাগার ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। বেশ কিছু পেটোয়া কন্ট্রাক্টর প্রভূত লাভ করেছে আর মমতা ব্যানার্জীর পোষ্য তৃণমূলীরা বিস্তর তোলাবাজি করার এবং সিন্ডিকেট ব্যবসার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কৃষকদের সমস্যার তেমন কোনো সমাধানই হয় নি। বরং সেগুলি আরও জটিল হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষিপণ্যের লাভজনক দাম পাওয়া অসম্ভব। যে দাম রাজ্য সরকার ঘোষণা করে তাতেও উৎপাদন ব্যয় এবং কৃষক পরিবারের শ্রমের দাম উসুল হয় না। স্বামীনাথন কমিশনের পরামর্শ আদৌ মানা হয় না। আবার যে দাম ঘোষণা হয়, সরকারি ক্ষেত্রে সেসব ক্রয় করার সময় মিড্‌ল ম্যান বা ফড়েদের উৎপাতে সবটুকুই প্রায় হারিয়ে যায়। গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েতগুলির যে ভূমিকা পালন করা উচিৎ তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এ রাজ্যে ছোট ছোট জোতে চাষ করা ক্ষুদ্র কৃষকদের সমস্যা গভীরভাবে বেড়েই চলেছে। সমাধানের কোনো পথই দেখা যাচ্ছে না।

দীর্ঘ বাম আমলে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের উৎপাদিত শস্য বিক্রয়ে পঞ্চায়েতগুলি এবং সর্বোপরি রাজ্যের কৃষক সংগঠনগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে, সেসব দিন সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে।

মোদির অসাধারণত্ব বিপজ্জনকভাবে প্রতিফলিত

ভারতের সাধারণ জনজীবন যখন অতিমারির দৌরাত্ম্যে প্রতিনিয়ত জেরবার, ত্রাহি রব উঠছে দরিদ্রের পর্ণকুটিরে তখনই, বেয়ারা তথ্য পরিবেশন করে অক্সফাম জানাচ্ছে যে, এদেশে অর্বুদপতি বা বিলিয়োনেয়ার ধনকুবেরের সংখ্যা আশাতীতভাবে স্ফীত হয়েছে। ২০২১ সালে ২০২০র তুলনায় প্রগলভ ধনপতির সংখ্যা বেড়েছে ৩২ জন। অর্থাৎ, ২০২০ সালে করোনা অতিমারির প্রকোপে জর্জরিত দেশে অর্বুদপতি ছিল ১০২ জন। তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪২।

দেশের সাধারণ মানুষের উপার্জন কমেছে আতঙ্কজনক গতিতে। বেকারত্ব গ্রাস করেছে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে। কলকারখানা বন্ধ হয়েছে অবিশ্বাস্য গতিতে। অপরিকল্পিত বা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা রহিত লকডাউন অসংখ্য মানুষের জীবন বিপর্যস্ত করেছে। প্রবাসী শ্রমিক, যাঁদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে পরিযায়ী হিসেবে, তাঁদের জীবিকা লোপাট হয়ে গেছে। তাঁদের বসবাসের আশ্রয় হারিয়ে গেছে। তাঁরা ঘরে ফিরে পরিবারের অন্যদের সঙ্গে বাঁচতে চেয়েছিলেন। রেল সংযোগ স্তব্ধ এবং কোনও দিশাই নেই। বাধ্য হয়ে, বেপরোয়া হয়ে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ পথে নেমেছেন। খাদ্য নেই। দিনগুজরানের মতো রেস্ত নেই। হাঁটাপথেই হাজার হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে মানুষ। কতজন যে এমন অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন তার কোনও হিসেব মোদি সরকার রাখে না। দেশের সাধারণ মানুষের কোনো সংবাদ বা তথ্য রাখার বদঅভ্যাস মোদি সরকারের নেই!

দেশের অর্থনীতি মোদি সরকারের অশেষ কৃপায় অন্ধকূপের অভিযাত্রী হয়ে উঠেছে। সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ভয়াবহ আকার নিয়েছে। কত না ঘটনার ঘনঘটা! পেট্রোল ডিজেলের দাম অতীতের সমস্ত রেকর্ড চূর্ণ করে উর্ধমুখী। দেশের মানুষ অসহ যন্ত্রণায় প্রতিদিন প্রতিরাতে নিরুপায় প্রহর গুনেছে। ঠিক তখনই ওরা 'মুদ্রা গোনে কোটি কোটি'। এই তো সুযোগ, যেমন করেই হোক দেশের সরকারকে ইচ্ছে মতো দুমড়ে মুচড়ে ব্যবহার করা হয়েছে শুধুই মুনাফা, আরও মুনাফার উন্মত্ত অন্বেষণে। অত্যন্ত সংখ্যালঘু কয়েকজন ধনকুবেরের অগাধ সম্পদ আয়ত্ত করার অদম্য স্পৃহা পূরণ হয়ে চলেছে বিপুল গতিতে। সামগ্রিকভাবে কর্পোরেটতন্ত্রই শুধু নয়। এইসব মুনাফা উন্মাদ কর্পোরেট কুলের শীর্ষে অবস্থানকারী দুটি গুজরাতি কোম্পানি, এক আম্বানি। অন্যজন আদানি। এদের উল্কাগতিতে সম্পত্তি সংগ্রহের উদ্দেশে বিচরণ এবং অঢেল সম্পদের মালিক হয়ে ওঠার পিছনে রাজ অনুগ্রহ বিশেষ ভূমিকায়।

ফোর্বস বিলিয়োনেয়র প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, সম্মিলিতভাবে ১০০টি ধনী শ্রেষ্ঠর পুঁজি নজিরবিহীনভাবে বেড়েছে ২০২১-এর অক্টোবর মাসে ৭৭৫ বিলিয়ন ডলারে পরিণত হয়েছে। এদের আশি শতাংশেরই তাদের সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছে করোনা অতিমারির কাল। এ এক দুর্ভাগ্যজনক পরিহাস। দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রতারিত হয়েছেন। প্রতারণা করেছে প্রত্যক্ষভাবে মোদি সরকার। বেশ লক্ষ করার বিষয় যে, মোদি জমানায় দেশের ২৮ জন অঢেল সম্পদের অধিকারী ব্যাঙ্কের ঋণগ্রহণ করে সেসব শোধ করার কোনো ইচ্ছেই দেখায় নি। তারা বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। এদের মধ্যে ১ জন (বিজয় মালিয়া) বাদে সবাই মোদির রাজ্যের মানুষ। হয়তো সে কারণেই মোদি সরকার এদের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ।

মোদি সরকারের সামান্যতম অনুভূতিও সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ নেই। সবকিছুই খোলামেলাভাবে আদানি আম্বানির মুনাফাবৃদ্ধির লক্ষ্যে চালিত। বাস্তবে ১০০টি বিপুলাকার কর্পোরেট কোম্পানি জাতির এমন দুঃসময়ে যে পরিমাণ সম্পদ জুটিয়েছে তার ২০ শতাংশ বা এক পঞ্চমাংশ শুধু আদানির ঘরেই জমা হয়েছে। আদানির অবস্থান যে নরেন্দ্র মোদির হৃদয়ের কাছে। মোদি স্বয়ং আদানির এমন উত্থানের পিছনে সদাসর্বদা সক্রিয়। এমনকী ভারতের সাধারণ মানুষের তিল তিল অর্থে গড়ে ওঠা সরকারি কোষাগার ভাঙিয়ে মোদি বিদেশে ভ্রমণে গেছেন; আর বিদেশের সরকারের সঙ্গে বার্তালাপ করেছেন আদানির ব্যবসায়িক সুযোগের। একথায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ এক কর্পোরেট কোম্পানির হয়ে দালালি করেছেন।

অবশ্য আম্বানিও বিশেষ পিছনে নেই। এই কোম্পানিটির ২০২০ সালে ছিল ৩৬.৮ বিলিয়ন (১ বিলিয়ন = ১০০ কোটি) ডলার। ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে নিশিযাপন করা ভারতীয়রা যখন প্রাণ বাঁচাতে অস্থির, সেইসময় অর্থাৎ, ২০২১ সালে আম্বানির সম্পত্তি দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫.৫ বিলিয়নে। ছিল রুমাল হয়ে গেছে বিড়াল!

মোদির 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ' এর কী অপরূপ বাস্তবতা! ''মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'! এসবই সম্ভব! আনন্দে আছে দেশ। হিন্দু রাষ্ট্র হল বলে।

উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, বড় বড় পুঁজি মালিকদের এমন কুৎসিত সম্পদ বৃদ্ধির কালে আম ভারতীয়দের মধ্যে ৮৪ শতাংশের মতো পরিবারের উপার্জন আতঙ্কজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বহু পরিবার দারিদ্রসীমার নীচে নেমে গেছে। এটাই তো প্রকৃত রামরাজ্য। অযোধ্যায় রামমন্দির, কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দিরের সঙ্গে গঙ্গানদীর সরাসরি সংযোগ এ সবই তো আম হিন্দুদের একমাত্র দাবি! মানুষ মরছে আর হিন্দুত্ব উল্লাসে মত্ত।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা মোদি-শাহ'র প্রশ্রয়ে এখন সরাসরি সংখ্যালঘু মানুষদের খুন করে, গণহত্যা সংগঠিত করে হিন্দুরাষ্ট্রের প্রকল্প সার্থক করতে উদগ্র আচরণে মত্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্য এসব নিয়েই তো মোদিকে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে হবে! জাতপাতের খেলায় আর আসর জমানো যাচ্ছে না। সরাসরি হিন্দু-মুসলমান সংঘাত সৃষ্টি করেই মোদির দল উত্তরপ্রদেশে বাঁচতে চাইছে।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-